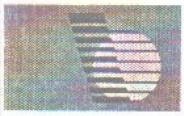

১১

জ্যোতির্বিজ্ঞান
ASTRONOMY

প্রধান শব্দ (Key Words) : মহাবিশ্ব, বিগ ব্যাং [illegible], বিগ ক্রাঞ্চ তত্ত্ব, মহাবিশ্বের পরিণতি, আবদ্ধ মহাবিশ্ব, উন্মুক্ত মহাবিশ্ব, সমতল মহাবিশ্ব, নক্ষত্র, ক্ষেত্র [illegible], শ্বেতবামন, কৃষ্ণবিবর, সুপারনোভা, নিউট্রন [illegible], রেডিও টেলিস্কোপ, অপটিক্যাল টেলিস্কোপ, [illegible] টেলিস্কোপ, এক্স-রে টেলিস্কোপ, কৃত্রিম উপগ্রহ, [illegible] কক্ষপথ।

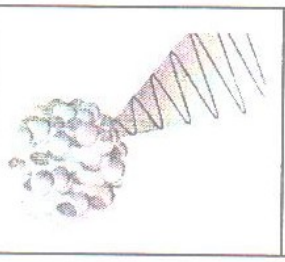
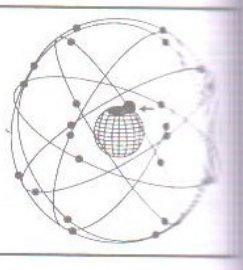

সূচনা
Introduction

যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তা-ই মহাবিশ্ব। পৃথিবী মহাবিশ্বের অংশ। ঠিক তেমনি সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সব গ্রহও মহাবিশ্বের অংশ। ধূলি, গ্যাসের তারা এবং মেঘ মহাবিশ্বের অংশ। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য এবং তার পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাবিস্ফোরণই এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির মূল রহস্য। আবার সংকোচন ও কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি অতঃপর তারার মৃত্যু এসব মহাবিশ্ব ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এছাড়া মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তু যেমন নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহসহ নানাবিধ পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত রেডিও টেলিস্কোপ, অপটিক্যাল টেলিস্কোপ, গামা-রে ও এক্স-রে এবং কৃত্রিম উপগ্রহের মূলনীতির আলোচনা এ অধ্যায়ের মূল বিষয়।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

- মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মহাবিশ্বের পরিণতি পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মহাবিশ্বের মূল বস্তু ও ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের মূল নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১১.১ মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য
Mystery of the creation of the Universe

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় প্রাচীনকাল হতে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য জানতে প্রয়োজন পড়েছে আপেক্ষিক তত্ত্বের, কণা পদার্থবিজ্ঞানের, কেন্দ্রিক পদার্থবিজ্ঞানের, তাপগতিবিজ্ঞানের, প্লাজমা ও কঠিনাবস্থার পদার্থবিজ্ঞানের এবং সর্বোপরি জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের। মহাবিশ্বের সৃষ্টি সংক্রান্ত বিজ্ঞান হলো বিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্ব বা Cosmology। বহুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং ইহুদি, খ্রিস্টান আর ইসলাম ধর্মের মতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল বেশ নিকট অতীতে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশপ উসার (Bishop Ussher) হিসাব করে বলেছিলেন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল 4004 খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। ওল্ড টেস্টামেন্টের লোকদের বয়স যোগ করে তিনি এই হিসাব পেয়েছিলেন। অন্যদিকে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতো কিছু লোকের মনে হয়েছিল মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপে। এখন প্রশ্ন হলো মহাবিশ্ব কী ? বা What is Universe? এর জবাব হলো যা কিছুর অস্তিত্ব আছে তাই-ই মহাবিশ্ব। পৃথিবী মহাবিশ্বের অংশ। ঠিক তেমনি সূর্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য সব গ্রহও মহাবিশ্বের অংশ। ধূলি গ্যাসের তারা এবং মেঘ মহাবিশ্বের অংশ। আর এগুলো একত্রে মিলেমিশে আমাদের এই সৌরজগৎ। অন্যান্য তারার মতো সূর্যও একটি উত্তপ্ত জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। সব মিলিয়ে বিস্ময়কর বিশাল এই মহাবিশ্ব।

বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের জন্ম শুরু হয় 1916 সালে আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব (Theory of General Relativity) প্রণয়নের পর থেকে। এই তত্ত্ব মহাকর্ষকে বিশ্বের স্থানকালের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ভাবতে শেখায়। নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের মধ্যে যে বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বীজ লুকিয়েছিল নিউটন তা লক্ষ করেননি। মহাকর্ষ তত্ত্ব বলে যে, এই বিশ্বের সকল জড় বস্তুই অন্য সকল জড় বস্তুকে আকর্ষণ

করে। এই আকর্ষণ যদিও দূরত্বের সঙ্গে কমে যায়, তা সত্ত্বেও এই পরস্পর আকর্ষণের ফলে সমস্ত বস্তুরই ক্রমাগত পরস্পরের সান্নিধ্যে চলে আসার কথা ও অবশেষে একত্রে মিশে যাওয়ার কথা। অর্থাৎ মহাকর্ষের প্রভাবে আমাদের পরিচিত বিশ্ব চিরস্থায়ী থাকতে পারে না।

1929 সালে এডউইন হাবল (Edwin Hubble)-এর মহাবিশ্বের প্রসারণ আবিষ্কারের ফলে এর উৎপত্তি সম্পর্কীয় আলোচনা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। **আজ থেকে 1500–2000 কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের আকৃতি ছিল ডিম্বাকার এবং এর ভর ছিল 10^{51} kg এবং ঘনত্ব 10^{21} kg m^{-3}। অভ্যন্তরীণ বিপুল তাপ ও চাপের কারণে প্রচণ্ড শব্দে ডিম্বাকার বস্তুর মহাবিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের এই মহাবিশ্ব। এটাই বিগ ব্যাং তত্ত্ব (Big bang theory)।** এখান থেকেই সময়, স্থান, শক্তি ও পদার্থের উৎপত্তি হয় বলে ধারণা করা হয়। **বিগ ব্যাং-এর কারণে সৃষ্ট খণ্ডাংশগুলো বিভিন্ন রূপ যেমন— গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উল্কা, ধূমকেতু ইত্যাদি নাম নিয়ে প্রতিনিয়ত নির্দিষ্ট হারে দূরে সরে যাচ্ছে [চিত্র ১১·১]। দূরে সরতে সরতে এক সময় এগুলো এদের শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। এর অর্থ হলে নীহারিকাগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।** ইহাই সম্প্রসারণ তত্ত্ব। যার দূরত্ব বেশি তার পরস্পর থেকে সরে যাবার গতিবেগও বেশি।

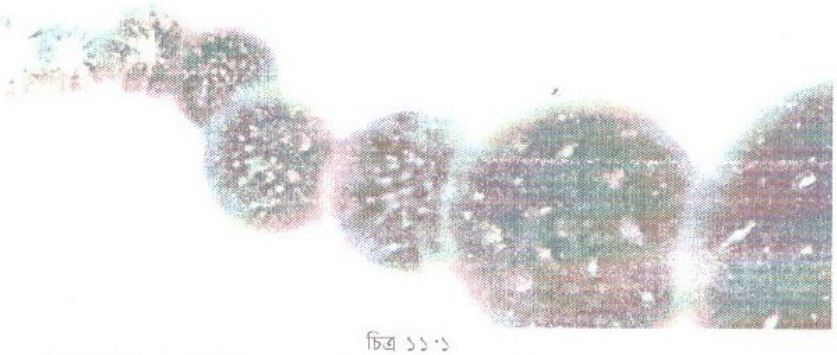

চিত্র ১১·১

1965 সালে আমেরিকার নিউজার্সিতে বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে আর্নো পেনজিয়াস (Arno Penzias) আ রবার্ট উইলসন (Robert Wilson) নতুন মাইক্রোওয়েভ অ্যান্টেনা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, একটা অদ্ভুত তরঙ্গ চারদিক হতে আসছে। তাঁরা বুঝলেন, এটা হলো মহাবিস্ফোরণের ফলে আলোর তরঙ্গের সরণের ফলে লাল পেরিয়ে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গে পরিণত হবার ফল। তাদের এই আবিষ্কারের জন্য 1978 সালে তারা পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন।

বিগ-ব্যাং ঘটনার পর নিহারিকাগুলো আর দূরে সরে না গিয়ে বরং পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসতে আসতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ঘনীভূত হবে। এটি **বিগ ক্রাঞ্চ তত্ত্ব** [চিত্র ১১·২]। বিগ ক্রাঞ্চ তত্ত্বের সমাপ্তিই হলো বিগ ব্যাং-এর সূচনা। এভাবেই বিগ ব্যাং ও বিগ ক্রাঞ্চ পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়। একে **পালসার (Pulsar) থিওরি** বলে।

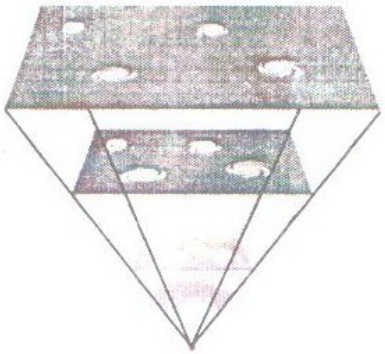

চিত্র ১১·২

বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের দূরসীমানায় টেলিস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেন যে, এই মহাবিশ্ব প্লাজমা অবস্থায় অর্থাৎ অস্বচ্ছ আয়নিত গ্যাসে পূর্ণ ছিল। পরোক্ষ হিসেবে দেখা গেছে যে, মহাবিস্ফোরণের 10^{-43} সেকেন্ড পর মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ছিল 10^{32} ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে 10^{10} গুণ। মহাবিস্ফোরণের এক সেকেন্ডের শতভাগের একভাগ সময়টিতে মহাবিশ্ব পরিপূর্ণ ছিল বিকিরণ, নিউট্রিনো এবং ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগলে। তাপমাত্রা তখনো এসব হালকা পদার্থ ও প্রতিপদার্থের কণিকা যুগল সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দিতে সক্ষম ছিল। প্রায় দুই সেকেন্ড পর মহাবিশ্ব এতটা ঠান্ডা হয়ে এলো যে, ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগল এখন আর নতুন করে সৃষ্টি হতে পারল না এবং ক্রমাগত এরা ধ্বংস হয়ে রূপ নিল শক্তিতে। অল্প সংখ্যক ইলেকট্রন শুধু অবশেষ থাকল ধনাত্মক প্রোটন কণিকার চার্জের ভারসাম্য বজায় রাখতে। বিকিরণ এখন প্রাধান্য করে সমস্ত জগৎ জুড়ে প্রতিটি প্রোটন, নিউট্রন বা ইলেকট্রনের জন্য প্রায় শত কোটি আলোক কণিকার। অর্থাৎ ফোটন চার্জ করছিল তখন মহাবিশ্বে। এরপর মহাবিশ্বের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে এবং উচ্চ শক্তি ফোটনের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে ইলেকট্রন-পজিট্রন মিলে যে হারে ফোটন তৈরি করে, সেই হারে আর ফোটন থেকে ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড় তৈরি করতে পারে না। মহাবিস্ফোরণের তিন মিনিটের মাথায় প্রোটন ও নিউট্রন মিলে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হতে থাকে। আরো দেখা যায় মহাবিস্ফোরণের মাত্র দশ লক্ষ বছর পরেই মহাবিশ্বের অতি উত্তপ্ত উত্তপ্ত বিস্তারমান বিকিরণ ও কণিকার পিন্ড তাপ হারিয়ে 3000° C নেমে এসেছে। আর এই তাপমাত্রায় এসেই

• জ্যোতিষ্ক দশ প্রকারঃ
(i) নক্ষত্র, (ii) ছায়াপথ, (iii) ধূমকেতু, (iv) উপগ্রহ, (v) নীহারিকা, (vi) উল্কা, (vii) গ্রহ, (viii) পালসার, (ix) কৃষ্ণগহ্বর, (x) কৃষ্ণবামন।

• এদের মধ্যে নীহারিকা, পালসার, কৃষ্ণগহ্বর, কৃষ্ণবামন অনুজ্জ্বল।

ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসসমূহের চারপাশে কক্ষপথ নিয়ে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। এ সময় বায়ু ও বিকিরণ ভারসাম্য লাভ করে একটি সুষম তাপমাত্রায় এসেছে।

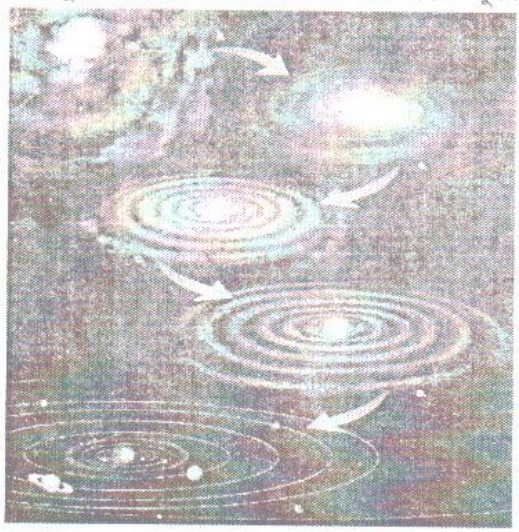

চিত্র ১১·৩

বিশ্বের প্রসারণ এবং বিশ্বে পর্যবেক্ষিত হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের শতাংশের অনুপাত 3 : 1। বিশ্ব সৃষ্টির পর থেকে সাত লক্ষ বছর পর এর তাপমাত্রা এত কমে যায় যে, ইলেকট্রন কক্ষপথে আসতে শুরু করে এবং পূর্ণাঙ্গ পরমাণু গঠন সম্পন্ন হয়। ইলেকট্রন পরমাণু গঠনে ব্যবহৃত হওয়ায় মুক্ত ইলেকট্রনের ঘাটতি দেখা দেয়। এজন্য ফোটন ইলেকট্রন মিথস্ক্রিয়া থেকে সরে গিয়ে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এর আগে পর্যন্ত বিশ্ব প্লাজমা পূর্ণ ছিল, যা দেখতে সূর্যের বর্ণমণ্ডলের মতো। মহাবিশ্বের এই প্রসারণকে বেলুনের সাথে কল্পনা করা যায়। ধরা যায়, বেলুনের ওপর কিছু রং এর ফোটা দেওয়া আছে। এখন বেলুনটিকে ফুলালে ফোটাগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে। মহাকাশে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলা অসংখ্য গ্যালাক্সির মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। আবার কখনো দেখা যায় এই প্রচণ্ড গতিতে চলমান দুটি গ্যালাক্সি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে প্রচণ্ড তাপ ও আলো সৃষ্টি করে ধ্বংস হয়ে যায়। গ্যাসের মেঘ আর ধূলিকণা হতে সৃষ্ট এই নক্ষত্র বা তারকা রাজ্য এবং পরবর্তীতে রূপ নেয় সৌরজগতে [চিত্র ১১·৩]। আর সেই নারকীয় ধ্বংসস্তূপ থেকে ছড়িয়ে পড়া রেডিও তরঙ্গের কিছুটা এসে ধরা পড়ে পৃথিবীর রেডিও টেলিস্কোপে।

হাবল এর প্রথম পর্যবেক্ষণের সময়ের তুলনায় বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ এখন তাদের টেলিস্কোপের দৃষ্টি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে এসব দূরতম অবস্থার গ্যালাক্সির যাত্রার শুরুর সময় হিসাব করে মহাবিশ্বের বয়স তাঁরা অনুমান করেছেন দেড় হাজার কোটি বছর।

মহাবিস্ফোরণের পর থেকে যত দিন যাচ্ছে মহাবিশ্বের প্রসারণ একইভাবে বাড়ছে। তবে এই প্রসারণ নিকটবর্তী গ্যালাক্সির জন্য প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ আমাদের সৌরজগৎ স্ফীত হচ্ছে না কিংবা গ্রহদের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বাড়ছে না। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ ও ধ্রুবমাতা বা অ্যান্ড্রোমিডা এবং আরো কয়েকটি ছোট গ্যালাক্সি মিলে লোকাল গ্যালাক্সি স্তবক তৈরি করেছে [চিত্র ১১·৪]।

চিত্র ১১·৪

মহাবিশ্ব অনির্দিষ্টভাবে প্রসারিত হতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট অবস্থার পর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে এই প্রসারণ থেমে যাবে এবং মহাবিশ্ব পুনরায় সংকোচিত হবে। এই সংকোচন একটি সংকট আকারে পৌঁছালে পুনরায় বিস্ফোরিত হবে এবং নতুন করে প্রসারণ ও তারকার সংকোচন ঘটবে। ফলে মহাবিশ্বের সীমা একবার বড় ও একবার ছোট হবে। অর্থাৎ সীমানা স্পন্দিত হবে। একে স্পন্দনশীল তত্ত্ব বলে। 8×10^9 বছর পর এ ঘটনা ঘটতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর "A Brief History of Time" (কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস) গ্রন্থে মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই 'বৃহৎ বিস্ফোরণ' তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

কাজ : মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ?

মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ বর্তমান প্রসারণের হার, বিশ্বের বক্রতা, বিশ্বে মোট বস্তুর পরিমাণ, মহবিশ্বের গড় ঘনত্ব, সংকট ঘনত্ব ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

কাজ : হাবল বিধি কী ?

1929 সলে এডুইন হাবল দেখিয়েছেন যে ছায়াপথসমূহ অপসারিত হচ্ছে এবং তাদের এই অপসারণ বেগের মান তাদের দূরত্বের সমানুপাতিক। ইহাই হাবল বিধি।

মহাবিশ্বের যে কোনো প্রসঙ্গ কাঠামো বিন্দু থেকে কোনো গ্যালাক্সির দূরত্ব d এবং পশ্চাদপসরণের বেগ v হলে হাবল-এর বিধি অনুসারে,

$v = Hd$, এখানে H হচ্ছে হাবল ধ্রুবক, এর মাত্রা সময়ের বিপরীত।

H এর মান এখনও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। হাবল ধ্রুবক-এর একটি যুক্তিসঙ্গত মান হলো 72 kms^{-1}/MPc ($1\ MPc = 3{\cdot}084 \times 10^{19}\ km$)।

গাণিতিক উদাহরণ

১। কোনো কোয়াসার থেকে আগত আলোক রশ্মি অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে পৃথিবী থেকে কোয়াসারটি $2{\cdot}7 \times 10^8\ ms^{-1}$ বেগে সরে যাচ্ছে। পৃথিবী হতে কোয়াসারটির দূরত্ব নির্ণয় কর। ($H = 72\ kms^{-1}/MPc$)।

সমাধান : হাবল সূত্র অনুযায়ী, আমরা জানি,

$$v = Hd$$

বা, $$d = \frac{v}{H}$$

$$\therefore\ d = \frac{2{\cdot}7 \times 10^8\ ms^{-1}}{72\ kms^{-1}/MPc}$$

$$= \frac{2{\cdot}7 \times 10^8\ ms^{-1} \times 3{\cdot}084 \times 10^{19}\ km}{72\ kms^{-1}} \quad [\because\ 1\ MPc = 3{\cdot}084 \times 10^{19}\ km]$$

$$= 1{\cdot}16 \times 10^{26}\ km$$

এখানে,

বেগ, $v = 2{\cdot}7 \times 10^8\ ms^{-1}$

হাবল ধ্রুবক, $H = 72\ kms^{-1}/MPc$

দূরত্ব, $d = ?$

১১·২ পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে মহাবিশ্বের পরিণতি

Ultimate fate of the universe in the light of physics

মহাবিশ্বের ভবিষ্যত বা পরিণতি কিংবা মহাবিশ্বের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীয় ইতিহাস কী হবে ? তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও চিন্তা-চেতনা থেমে নেই। বর্তমান জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেও বিশ্বের নিয়তি সম্বন্ধে সঠিকভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়, কারণ এখানে কয়েকটা অনিশ্চয়তা রয়ে যায়। কিন্তু বর্তমান জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের নিয়তি কি হবে সেটা কয়েকটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায়।

ধরা যাক 1,500 কোটি বছর আগে ঘটেছিল এক বিশাল মহাবিস্ফোরণ আর এর ফলে আজও সব গ্যালাক্সিজোট প্রচণ্ডবেগে ছুটছে দিগ্বিদিকে। কিন্তু তারপর কী হবে ? স্পষ্টতই এ প্রশ্নের দুটি জবাব হতে পারে। একটা হলো এই ছুটে চলা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে, আরেকটা হলো মহাবিশ্বের বস্তুপুঞ্জের আকর্ষণে একদিন এই ছুটে চলা থেমে যাবে আর তখন আবার সব গ্যালাক্সি ভেতরের দিকে ছুটতে থাকবে। ক্রমাগত ছুটে চলার যে সম্ভাবনা তাকে জ্যোতির্বিদরা বলেন 'উন্মুক্ত মহাবিশ্ব' (open universe), আর ছুটে চলা থেমে গিয়ে আবার ভেতর দিকে এসে পড়ার যে সম্ভাবনা তাকে বলেন 'আবদ্ধ মহাবিশ্ব' (closed universe)।

এই দুটি সম্ভাবনার মধ্যে কোনটা যে শেষ পর্যন্ত খাটবে তা নির্ভর করছে মহাবিশ্বে আদতে কতটা বস্তু আছে তার ওপরে। মহাবিশ্বে যদি একটা সঙ্কটসীমার চেয়ে বেশি বস্তু থাকে তাহলে তার আকর্ষণের টানে মহাবিশ্বের বাইরের

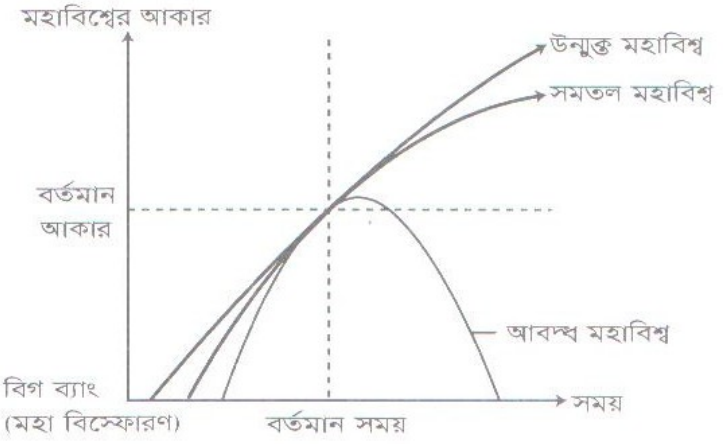

চিত্র ১১·৫

দিকে ছুটে চলা একদিন থেমে যাবে আর শুরু হবে ভেতর দিক ছোটা। এই সঙ্কটসীমা যে কত তার হিসাব করা হয়েছে—সেটা প্রতি ঘন মিটারে তিনটি পরমাণু। কিন্তু দেখা যায় আমাদের জানা মহাবিশ্বে সব গ্যালাক্সিতে যে

পরিমাণ বস্তু খুঁজে পাওয়া যায় তা এই সঙ্কটসীমার 10 থেকে 30 শতাংশ। কারো কারো হিসাবে এটা আরো কম। তবে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন আসলে মহাবিশ্বে বস্তু আছে আরো অনেক বেশি, ভালো করে খুঁজলে সেসব বস্তু একদিন নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলছেন, আরো একটা তৃতীয় সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না, তা হলো মহাবিশ্বে যে পরিমাণ বস্তু আছে তাতে তার বিস্তার এক সময় থেমে যাবে ঠিকই, তবে ভেতর দিকে ধসে পড়া ঘটবে না; এই মতকে বলা হচ্ছে 'সমতল মহাবিশ্ব' (flat universe)।

মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে তিনটি মত রয়েছে :

(১) 'আবদ্ধ মহাবিশ্ব' মডেলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ভবিষ্যতে একদিন থেমে যাবে এবং আবার সঙ্কুচিত হতে হতে মহাবিশ্ব একটি বিন্দুতে এসে ধসে পড়বে।

(২) 'উন্মুক্ত মহাবিশ্ব' মডেলে মহাবিশ্ব অনন্তকাল প্রসারিত হবে।

(৩) 'সমতল মহাবিশ্ব' মডেলে মহাবিশ্ব ধসে পড়বে না, আবার অনন্তকাল প্রসারিতও হবে না [চিত্র ১১.৫]।

এই তিনটি সম্ভাবনার ফলাফল কী দাঁড়াবে তাও বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন। আবদ্ধ বিশ্বের হিসাবটা খুব সহজ। সূর্য সাদা বামন হয়ে যাবার 3,000 কোটি বছর পর মহাবিশ্বের বিস্তার থেমে যাবে; একটা ভিডিও ছবি উল্টো দিকে চালালে যেমন হয় তেমনি সব কিছু উল্টোভাবে ঘটতে শুরু করবে অর্থাৎ গ্যালাক্সি জোটগুলো সব পরস্পর কাছাকাছি আসতে শুরু করবে। এভাবে 5,000 কোটি বছর চলার পর আসবে এক সঙ্কটকাল। সব গ্যালাক্সি পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগে যাবে; তারপর একটা আরেকটার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করবে। বিশাল সব অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি হয়ে জ্বলে উঠবে অসংখ্য অতি নবতারা আর অতি কোয়াসার। রাতের আকাশ হয়ে উঠবে সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল; মহাকাশের তাপমাত্রা বেড়ে হবে তারাদের মতো উষ্ণ। মহাধসের এক লক্ষ বছর আগে মহাবিশ্ব জুড়ে প্রচণ্ড উষ্ণ আর ঘন বস্তুর অসংখ্য কৃষ্ণবিবর তৈরি হতে আরম্ভ করবে। অবশেষে 8,000 কোটি বছর পর এক পরম ধসে মহাবিশ্বের সব কিছু একাকার হয়ে গিয়ে সৃষ্টি হবে এক মহা কৃষ্ণবিবর যার ভর হবে সমগ্র মহাবিশ্বের সমান। মহাবিশ্বের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্থান-কালের সৃষ্টি হয়েছিল; কাজেই মহাবিশ্বের ইতি ঘটলে স্থান আর কালও উধাও হয়ে যাবে। স্থান-কালহীন সেই মহাবিশ্বে টিকে থাকবে শুধু পরম শূন্যতা।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলছেন এই পরম ধসে সব কিছু যে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যাবে তা নয়, এতে যে শক্তি ছাড়া পাবে তার ফলে ঘটবে আরেক বিস্ফোরণ, সৃষ্টি হবে আরেক মহাবিশ্ব। এভাবে হয়তো ছন্দময় দোলায় একের পর এক নতুন নতুন মহাবিশ্ব সৃষ্টি হতেই থাকবে।

আবদ্ধ মহাবিশ্বের এই হিসাবের তুলনায় সমতল মহাবিশ্ব আর উন্মুক্ত মহাবিশ্বের হিসাব বেশ কিছুটা ধোঁয়াটে গোছের। এই দুই মতের শেষ যে ঠিক কীভাবে হবে তা বলা শক্ত; তবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে মহাবিশ্ব ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে যাবে। আরো বহু হাজার কোটি বছর ধরে গ্যালাক্সিরা তাদের ভেতর ধূলো আর গ্যাসের পাঁজা থেকে নক্ষত্র সৃষ্টি করে যেতে থাকবে। সূর্যের মতো আকারের তারাদের জীবনকাল মোটামুটি 10^{10} বছর; তবে খুব ছোট যে সব তারা মিনমিনে আলো দেয় তারা হয়তো এর চেয়ে 10,000 গুণ বেশি দিন (10^{14} বছর) বাঁচবে। অর্থাৎ আজ থেকে 10 লক্ষ কোটি বছর পরে মহাবিশ্বে থাকবে শুধু অতি ছোট আকারের লাল বামনরা। পৃথিবী যদি সূর্যের লাল দানব পর্যায়ে বড় হয়ে না যায় তবে পৃথিবী থেকে সারা আকাশকে দেখাবে ঘোর কালো। সূর্যের শবদেহ সাদা দানব থেকে ঠাণ্ডা হতে হতে একটা কালো অন্ধকার পিণ্ডে পরিণত হবে, তার চারপাশে হয়তো তখনও ঘুরবে পৃথিবীর ছাইপোড়া দেহ।

এই অবস্থায় পৌঁছাতে নীহারিকার সময় লাগবে 10^{14} থেকে 10^{27} বছর। একদল নীহারিকা শুধু একটি মাত্র কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হবে। তাই 10^{27} বছর পরে সমগ্র বিশ্ব এই নীহারিকা কৃষ্ণ বিবরের সমষ্টিতে পরিণত হবে। তাদের মাঝখানে থাকবে বিশাল শূন্যস্থান যেখানে কতগুলো পথভ্রষ্ট শ্বেত বামন, নিউট্রন নক্ষত্র বা কৃষ্ণ বিবর একা একা ভ্রমণ করতে থাকবে [চিত্র ১১·৬]। একটি কৃষ্ণ বিবর চিরস্থায়ী নয় বরং তা সামান্য পরিমাণে বিকিরণ নির্গত করে বহুকাল পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই বিকিরণতত্ত্বের ভিত্তি আবিষ্কার করেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী S. W. Hawking (এস. ডবলিউ হকিং) এবং এটা 'হকিং বিকিরণ' (Hawking Radiation) নামে অভিহিত। নীহারিকা কৃষ্ণ বিবর ভরবিশিষ্ট একটি কৃষ্ণ বিবর বাঁচে প্রায় 10^{67} বছর। নীহারিকা কৃষ্ণ বিবর বহুগুণ বড় এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়গুলো 10^{100} বছর পর্যন্ত বাঁচবে। কৃষ্ণ বিবর বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং বর্তমান বিশ্বে যে নীহারিকাগুলো আছে তাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন থেকে একশ লক্ষ কোটি বছর পর লাল বামনদের আলোও নিভে যাবে। মহাকাশে তখন আর কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না। তখন বস্তু থাকবে শুধু অসংখ্য তারার শবদেহে; সেসব শবদেহ হলো কৃষ্ণবিবর, নিউট্রন তারা আর কালো বামন। বাকি যে

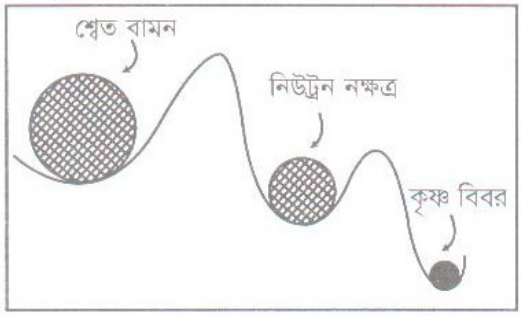

চিত্র ১১·৬

সব গ্রহ-উপগ্রহ গ্রহাণু থাকবে তাদেরও কারো গা থেকে কোনো তেজ বিকিরিত হবে না; সব কিছু থেকে সব তেজ নিঃশেষ হয়ে যাবে। ক্রমে ক্রমে মহাবিশ্বের সব প্রোটনেরও ক্ষয় হতে থাকবে— অবশ্য বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রোটনের ক্ষয় হতে লাগবে প্রায় 10^{32} বছর; তখন শুধু কৃষ্ণবিবর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না । কিন্তু এই কৃষ্ণবিবরই কী অক্ষয়? একদিন তাদেরও ক্ষয় হবে, তবে সে কতদিনে—তার হিসাব কল্পনা করাও কঠিন, হয়তো 10^{63} (অর্থাৎ এক-এর পেছনে 63-টা শূন্য) বছর পর। ততদিনে সেই মহাবিশ্ব জুড়ে থাকবে শুধু এক মহাশূন্যতা। পরম একীভূত তত্ত্ব অনুসারে অথবা মধ্যাকর্ষণ সূত্র এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে প্রোটন চিরস্থায়ী নয় তাই মহাবিশ্বের পরিণতি ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

কাজ : মহাবিশ্বের প্রসারণ কত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং কোন সময়ে এই প্রসারণ বন্ধ হবে ?

যদি সংকট ঘনত্বের মান বর্তমান গড় ঘনত্বের বেশি হয় সেক্ষেত্রে প্রসারণ আজীবন চলতে থাকবে। যদি সংকট ঘনত্বের মান বর্তমান গড় ঘনত্বের সমান হয় সেক্ষেত্রে বিশ্বের প্রসারণ ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকবে কিন্তু কখনোই একেবারে থেমে যাবে না।

পর্যবেক্ষণমূলক কাজ : মহাবিশ্বে কখন সংকোচন শুরু হবে ?

মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব যদি সংকট ঘনত্বের বেশি হয় তাহলে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ মহাবিশ্বের প্রসারণকে এক সময়ে থামিয়ে দিয়ে শুরু করবে বিশ্ব জুড়ে মহাসংকোচন।

১১.৩ মহাবিশ্বের মূল বস্তু ও ঘটনা
Principal Materials and events of the Universe

আমাদের আবাস ভূমি পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে রয়েছে অসীম আকাশ। আদি অন্তহীন এই আকাশকে বলা হয় মহাকাশ বা নভোমণ্ডল। বিজ্ঞানীদের মতে মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও শক্তি যে অঞ্চলে বিন্যস্ত বা ভাসমান তার নাম মহাকাশ। মহাকাশের শুরু বা শেষ নেই। মহাকাশে অসংখ্য **জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড** অবস্থান করছে, যেমন—সূর্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা ইত্যাদি। এদের নাম **জ্যোতিষ্ক** (Luminary)। এরা সুশৃঙ্খলভাবে নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরছে। আজকাল চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা ছাড়াও অনুজ্জ্বল নীহারিকা, পালসার, কৃষ্ণ বামন, কৃষ্ণ গহ্বর ইত্যাদি সব কিছুকেই জ্যোতিষ্ক বলে। এদের সবাইকে নিয়ে যা গঠিত হয়েছে, তার নামই **মহাবিশ্ব**। নক্ষত্রগুলো হলো **জ্বলন্ত গ্যাস পিণ্ড**। এদের নিজের আলো ও উত্তাপ রয়েছে। প্রতিনিয়তই নতুন নতুন নক্ষত্র বা তারা সৃষ্টি হচ্ছে। পুরাতন তারা ঠান্ডা হয়ে গেলে এবং নিভে গেলে বিপুল পরিমাণে ধূলি, গ্যাস প্রভৃতি মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়। পরবর্তীতে ঐ উপাদানগুলো থেকে নতুন তারা সৃষ্টি হতে পারে।

এই মহাবিশ্বের মৌলিক উপাদান হলো তিনটি।

(ক) সৌরজগৎ (Solar system), (খ) নক্ষত্রপুঞ্জ (Stars) ও (গ) গ্যালাক্সি (Glaxies)

সৌরজগৎ (Solar system)

সৌরজগতে রয়েছে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা, গ্রহাণুসহ গ্যাস ও ধূলিকণা। সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরছে ৪টি গ্রহ। আবার গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরছে উপগ্রহ। সৌরজগতের মধ্যে কেবল সূর্যেরই আলো আছে। সকল গ্রহ, উপগ্রহ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। সৌরজগতে গ্রহ, উপগ্রহ ছাড়া রয়েছে অনিয়মিত আকারের উল্কা, ধূমকেতু, গ্রহাণু, গ্যাস ও ধূলিকণা সহ নানাবিধ কঠিন বস্তু।

নক্ষত্র (Stars)

পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয় নক্ষত্রগুলো যেন মহাকাশের একই সমতলে অবস্থান করছে। পৃথিবী থেকে এদের দূরত্ব অনেক বেশি বলে এমনটি মনে হয়। সূর্য পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব 15 কোটি কিলোমিটার। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে আলোকের সময় লাগে 8 মিনিট 19 সেকেন্ড। অন্যান্য নক্ষত্রের দূরত্ব এত বেশি যে তা আলোক বর্ষে প্রকাশ করা হয়। সূর্যে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে। প্রচণ্ড তাপে সর্বদা ফিশন বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে। এই বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন হতে হিলিয়াম গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই রূপান্তরের সময় ভরের যে পার্থক্য ঘটে তা $E = mc^2$ সূত্রানুসারে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই বিক্রিয়ায় প্রতি সেকেন্ডে 4×10^{26} জুল শক্তি বিকিরণ করে। সূর্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস আছে তা থেকে কোটি কোটি বছর আলো ও তাপ পাওয়া যাবে। সূর্য ক্রমশ ভর হারোনার ফলে সংকুচিত হচ্ছে। তবে এই সংকোচন 100 কোটি বছর ধরে চলবে। সূর্য থেকে প্রতি সেকেন্ডে নির্গত শক্তির পরিমাণকে সৌর ঔজ্জ্বল্য বলে। গাণিতিকভাবে সৌর ঔজ্জ্বল্য $L_\odot = 4\pi R^2 S$, যেখানে S = সৌর ধ্রুবক = 1.38×10^3, R = সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের ব্যাসার্ধ যার মান $1\ AU = 1.496 \times 10^{11}$ m।

গ্যালাক্সি (Galaxies)

মহাকর্ষ বলের প্রভাবে গ্যাসীয় পদার্থের সংকোচন হয় যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সির মধ্যে গ্যাসের মহাকর্ষীয় ঘনীভবনের ফলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম মিলে তৈরি ঘনীভূত গ্যাসের অণু-পরমাণুর মধ্যে ঘর্ষ বেড়ে যাওয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে নিউক্লীয় ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হয় এবং বিপুল পরিমাণে শক্তি নির্গত হয়। নক্ষত্র ও সূর্য এভাবেই জ্বলে ওঠে। অনেকগুলো নক্ষত্রের সমাবেশকে গ্যালাক্সি বলে। আকাশ গঙ্গা নামক ছায়াপথে আমরা বা করি। এই ছায়াপথে প্রায় 10^{11} সংখ্যক নক্ষত্র রয়েছে।

ধূমকেতু (Comet)

পানি, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস কোনো নিরেট ক্ষুদ্র শিলা খণ্ডের উপর জমে তৈরি হয় ধূমকেতু। সূর্যে চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরার সময় এর সামনের দিকের পানি বাষ্পে পরিণত হয় এবং বিকিরণ চাপে সামনের দিকে একটি স্ফীত মাথা ও পেছনের দিকে সরু লেজের মতো হয়। দেখতে অনেকটা ঝাড়ুর মতো দেখায়। ৭৬ বছর পর পর এদের একবার দেখা যায়। হ্যালির ধূমকেতু এমন একটি ধূমকেতু।

উল্কা (Meteors)

আকাশে অনেক সময় ছোট আগুনের গোলা ছুটতে দেখা যায়। এরা নক্ষত্র বা তারা নয়। খুব ক্ষুদ্র শিলা খণ্ড যখন পৃথিবীর কাছাকাছি আসে তখন পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে প্রচণ্ড বেগে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং বায়ুর কণার সাথে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে এবং পৃথিবীতে পতনের আগেই নিভে যায়। ইহাই উল্কা।

মৌলিক কণা (Fundamental particles)

বিশ্বজগতের সমস্ত প্রকার জড় পদার্থ মৌলিক কণার সমন্বয়ে গঠিত। এই সকল কণা পরম, আদি বা প্রাথমিক এবং অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম কণা। এই সকল কণা 1 বা 0 (শূন্য) আধান যুক্ত। আধান ও চৌম্বক মোমেন্ট ছাড়া কণিকা ও প্রতিকণিকা একই রকম। সকল বিক্রিয়ায় এদের আধান, ভরশক্তি ও ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে। মেসন ও ফোটন ছাড়া সকল কণিকার প্রতিকণা (antiparticle) আছে। মৌলিক কণা তিন ধরনের :

(ক) ক্ষেত্রকণা, (খ) লেপটন কণা ও (গ) হ্যাড্রন কণা।

(ক) ক্ষেত্রকণা : ফোটন, গেজ বোসন এবং গ্রাভিটন এর সমন্বয়ে ক্ষেত্রকণা গঠিত। এরা যথাক্রমে বিদ্যুৎ চুম্বকীয়, দুর্বল নিউক্লীয় বল এবং মহাকর্ষ পরিক্রিয়া বাহক কণা।

(খ) লেপটন কণা : এ সকল কণা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় এবং দুর্বল নিউক্লীয় পরিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু কখনও শক্তিশালী নিউক্লীয় পরিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। এদের স্পিন $\frac{1}{2}$ এবং জীবনকাল অসীম। লেপটন কণা আবার তিন ধরনের— (১) ইলেকট্রন গোষ্ঠীয় লেপটন, (২) মিওন গোষ্ঠীয় লেপটন, (৩) টাউ গোষ্ঠীয় লেপটন। ইলেকট্রন হলো উল্লেখযোগ্য লেপটন কণা।

(গ) হ্যাড্রন কণা : যে সকল মৌলিক কণা শক্তিশালী নিউক্লীয়, বিদ্যুৎ চুম্বকীয় এবং দুর্বল নিউক্লীয় এই তিন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারে তাদেরকে হ্যাড্রন কণা বলে। হ্যাড্রন কণা আবার দুই ধরনের। যথা—(১) মেসন ও (২) বেরিয়ন। মেসনের স্পিন 0 (শূন্য), কিন্তু বেরিয়নের স্পিন শূন্য নয়।

এমন অনেক কণিকা আছে যার ভর, স্পিন অন্য কণিকার সমান কিন্তু চার্জ, বেরিয়ন সংখ্যা, লেপটন সংখ্যা অন্য কণিকার সমান কিন্তু বিপরীতধর্মী। এগুলোকে প্রতিকণা (Antiparticle) বলে।

ঈশ্বর কণা (God's particle) : হিগস বোসন ক্ষেত্রনামক তাত্ত্বিক বল ক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। ভরহীন কোনো কণা এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তা ধীরে ধীরে ভর লাভ করে। ফলে চলার গতি হ্রাস পায়। এই ক্ষেত্রের মাধ্যমেই ভর কণাতে স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ হিগস ক্ষেত্র ভর সৃষ্টি করতে পারে না, তা কেবল কণাতে স্থানান্তর করে হিগ্‌স বোসনের মাধ্যমে। এই হিগস বোসনই ঈশ্বর কণা বা God's particle নামে পরিচিত।

কোয়ার্ক (Quark) : কোয়ার্ক হলো অতি পারমাণবিক কণা, যা দ্বারা প্রোটন ও নিউট্রনসমূহ গঠিত। বিজ্ঞানী গেলম্যান অতি পারমাণবিক এই কণাসমূহের নামকরণ করেন কোয়ার্ক। বিজ্ঞানীরা কোয়ার্ককে এখনও পর্যন্ত মৌলিক কণা মনে করেন। এ পর্যন্ত ছয় ধরনের কোয়ার্কের সন্ধান পাওয়া গেছে। কোয়ার্কের নিজস্ব কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে। কোয়ার্কের হাইপার চার্জ ও ইলেকট্রনীয় চার্জ ভগ্নাংশিক মানসম্পন্ন। সকল কোয়ার্কই ফার্মিয়ন যাদের স্পিন $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ .....।

নক্ষত্রের জীবন কাহিনী
Life history of stars

(ক) নক্ষত্রের জন্ম (Birth of a star)

রাতের বেলায় পরিষ্কার নীল আকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য আলোক বিন্দু মিট মিট করে জ্বলতে দেখা যায়। এদেরকে নক্ষত্র বলে। খালি চোখে হাজার হাজার নক্ষত্র দেখা যায়। নক্ষত্র হলো জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড যা গ্যাস এবং

ধূলিকণার সমন্বয়ে গঠিত। ধারণা করা হয় যে, এক মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি। নক্ষত্র সৃষ্টির আদিতে মহাকাশের বিস্তৃত বিশাল অঞ্চল জুড়ে শীতল হাইড্রোজেন, হিলিয়ামসহ অন্যান্য গ্যাসের পরমাণু ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় ছিল। একে গ্যাসের ধূলিমেঘ (dust cloud) বলে। ধূলিমেঘে প্রায় 75% হাইড্রোজেন, 24% হিলিয়াম এবং কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেনসহ অন্যান্য গ্যাস 1% ছিল।

আমরা জানি পরমাণু নিরপেক্ষ এবং এদের মধ্যে কোনো বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ নেই। এদের মধ্যে একমাত্র ক্রিয়াশীল বল হলো মহাকর্ষ বল। এই মহাকর্ষ বলের প্রভাবে গ্যাস পরমাণুর মেঘ আস্তে আস্তে জমাট বাঁধতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় যেহেতু গ্যাস পরমাণুর মধ্যকার গড় দূরত্ব কমতে থাকে, সুতরাং এদের স্থিতিশক্তিও কমতে থাকে। শক্তির নিত্যতা বজায় রাখার জন্য এদের গতিশক্তির বৃদ্ধি ঘটে এবং পরমাণুর মধ্যে সংঘর্ষ বাড়ে। গতিশক্তি বৃদ্ধি এবং সংঘর্ষের কারণে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। মহাকর্ষ বলের টানে এই ধূলিমেঘ যত সঙ্কুচিত হতে থাকে তত অধিক সংখ্যক পরমাণু কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। ফলে কেন্দ্রের নিকটবর্তী অংশের ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা উভয়ই বাইরের অংশের তুলনায় দ্রুত বাড়তে থাকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এই গ্যাসপিণ্ড থেকে বিকিরণ শক্তির পরিমাণও বাড়তে থাকে এবং গ্যাসপিণ্ড থেকে অনুজ্জ্বল আলো নির্গত হয়। এভাবে গ্যাসপিণ্ডের সঙ্কোচন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং কেন্দ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধিও অব্যাহত থাকে। তাপমাত্রা বেড়ে যখন 10^7 K-এ পৌছায় তখন নিউক্লীয় ফিউশন (Nuclear fusion) বিক্রিয়া শুরু হয়। এই ফিউশন বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় এবং কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে। এর ফলে গভীর বহির্চাপের সৃষ্টি হয়। বিকিরণ থেকে সৃষ্ট এই বহির্চাপ মহাকর্ষের সঙ্কোচনকে বাধা প্রদান করে। যখন বহির্চাপ এবং সঙ্কোচন বল সমান হয় তখন সুস্থিত (stable) বা সাম্যাবস্থা সৃষ্টি হয়। এভাবে একটি তারকা পূর্ণতা এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। অবশ্য এ ধরনের ধ্বংসোন্মুখ গ্যাস ও ধূলিকণার মেঘপুঞ্জ থেকে একটি মাত্র জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড তৈরি না হয়ে শত শত তারকার সমন্বয়ে নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি হয়। বয়স বাড়ার সাথে নক্ষত্রপুঞ্জের আকার বাড়তে থাকে এবং নক্ষত্রগুলির মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এক সময়ে এরা স্বতন্ত্র তারকা বা নক্ষত্র হিসেবে দূরে সরে যায়। তবে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কোটি কোটি বছর লাগে। আমাদের সূর্যও সম্ভবত এভাবেই নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসেছে আজ থেকে 500 কোটি বছর আগে। ১১.৭ চিত্রে সূর্যের গঠন দেখানো হলো।

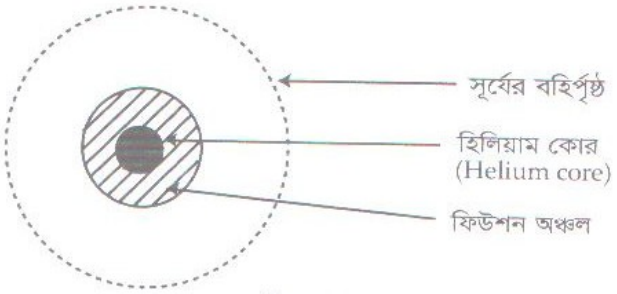

চিত্র ১১.৭

হিসাব : একই পরম ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট 2টি তারার মধ্যে একটি অপরটি থেকে 1000 গুণ দূরে অবস্থিত। এদের ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য কত হবে ? কোনটির ঔজ্জ্বল্য বেশি হবে ?

আমরা জানি, $m_2 - m_1 = 5 \log \frac{d_2}{d_1}$

$$= 5 \log \left(\frac{1000\, d_1}{d_1} \right)$$

$$= 5 \log 10^3 = 15$$

$$\therefore \quad m_2 = 15 + m_1$$

অর্থাৎ তারাদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্যের পার্থক্য হবে 15 একক। ঔজ্জ্বল্যের স্কেল কম ঔজ্জ্বল্যের সাংখ্যিক মান বেশি হওয়ার কারণে দূরবর্তী তারার ঔজ্জ্বল্য 15 একক বেশি হবে।

(খ) নক্ষত্রের মৃত্যু (Death of a star)

যদিও একটি নক্ষত্রের সুস্থিত বা সাম্যাবস্থা কোটি কোটি বছর ধরে চলবে, তবুও প্রশ্ন জাগে যখন হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে তখন কি ঘটবে ? চিত্র ১১.৮-এ একটি হিলিয়াম কোর বা মূল অংশ এবং এর বাইরে হাইড্রোজেনের আবরণ দেখান হয়েছে। কোরের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা এক কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি; কিন্তু বহিরাবরণের তাপমাত্রা মাত্র কয়েক হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস। যদিও হাইড্রোজেন আবরণ বাইরে রয়েছে; কিন্তু তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশি না হওয়ায় ফিউশন বিক্রিয়া ঘটে না। ফিউশন বিক্রিয়া বন্ধ হলে কোরে উৎপন্ন বহির্মুখী চাপ কমতে থাকে এবং মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলের কারণে সঙ্কোচন বাড়তে থাকে। অর্থাৎ আকর্ষণ বল প্রাধান্য লাভ করে এবং কোরের সঙ্কোচন চলতে থাকে।

যে সমস্ত নক্ষত্র কম ভরের সেগুলো হাইড্রোজেন জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে সঙ্কোচনের ফলে মূল অংশের ঘনত্ব বাড়ে এবং তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায় এবং বহির্ভাগে প্রসারণ ঘটে। তবে মূল অংশের তাপমাত্রা এতটা বাড়ে না যে হিলিয়াম ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হতে পারে। বাইরের আবরণ স্ফীতির ফলে তারকার আকার অনেক বড় হয় এবং তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় তারকার পৃষ্ঠ থেকে নির্গত বিকিরণ লালচে দেখায়। এই তারকাকে রক্তিম দৈত্য (red giant) বলে। এরপর এটি এমন একটি ধাপে পৌঁছায় যে এর বাইরের আবরণ বিচ্ছিন্ন বা ভেঙ্গে যায়। অবশিষ্ট যা থাকে তাকে শ্বেত বামন (white dwarf) বলে। সময়ের সাথে শ্বেত বামন নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা কমতে কমতে একসময়ে কালো বামন (black dwarf) হয় এবং মৃত্যু ঘটে।

চিত্র ১১·৮

তবে যে সমস্ত তারকার ভর অনেক বেশি সেগুলোতে মহাকর্ষ আকর্ষণ বলের ফলে মূল অংশের সঙ্কোচন বেশি হয় এবং তাপমাত্রাও অনেক বেড়ে যায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে যখন 10 কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছায় তখন হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হয়। এক্ষেত্রে তিনটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন নিউক্লিয়াস গঠন করে এবং সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে শক্তি নির্গত করে। এই শক্তি আকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি করে এবং আকর্ষণ বলকে প্রতিহত করে সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করে। তবে কোরের ভেতরের চাপ বৃদ্ধির প্রভাব বাইরের আবরণে বিস্তার লাভ করে এবং আবরণেরও প্রসারণ ঘটতে থাকে। অর্থাৎ তারকার আকারও বেড়ে যায় এবং উজ্জ্বলতাও বাড়ে। একটি পূর্ণ তারকার চেয়ে শতগুণ বড় হয়ে সুস্থিত (stable) অবস্থায় আসে। বহিরাবরণের প্রসারণের ফলে তাপমাত্রা কমে যায় এবং তারকা লালচে দেখায়। এ অবস্থায় বা ধাপের তারকাকে বলা হয় **রক্তিম দৈত্য বা অতি রক্তিম দৈত্য তারকা** (super giant star)। সূর্য যখন হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ করে এই ধাপে পৌঁছাবে তখন সূর্যের আকার এতটা বেড়ে যাবে যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং এমনকি মঙ্গলগ্রহও গ্রাস করে ফেলবে। অবশ্য এই অবস্থা সৃষ্টি হতে এখনও 600 কোটি বছর দেরি আছে।

তারকার আকার যদি আরও বড় হয়, তবে হিলিয়াম শেষ হলে কার্বন এবং অন্যান্য জ্বালানি ব্যবহার করে লৌহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো রক্তিম দৈত্য অবস্থার পরে কী ঘটবে ? এর পরের অবস্থাই শ্বেত বামন (white dwarf) অবস্থা যা আগেই বলা হয়েছে। আমরা শ্বেত বামন অবস্থাকে নক্ষত্রের অন্তিম অবস্থা হিসেবে ভাবতে পারি।

ভিন্ন ভিন্ন ভরের তারকা ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করে। কম বা মাঝারি ভরের নক্ষত্র হাইড্রোজেন জ্বালানি নিঃশেষ করে তুলনামূলকভাবে বেশ নীরবেই মৃত্যুবরণ করে। এদের জীবনচক্রে সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো বাইরের আবরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে নেবুলা (Nebula) শ্রেণির গ্রহ সৃষ্টি। কিন্তু **সূর্যের ভরের তুলনায় অনেক ভারী নক্ষত্রগুলো জ্বালানি শেষ হলে সঙ্কোচন অত্যন্ত তীব্র হয় এবং মূল অংশের ঘনত্ব এত বেড়ে যায় যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণকে বলা হয় সুপারনোভা (supernova) বিস্ফোরণ।** 1054 খ্রিস্টাব্দে চীনা জ্যোতির্বিদরা এই ধরনের সুপারনোভা বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করেন যা বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত দিনের বেলায়ও প্রজ্বলিত অবস্থায় দেখা গেছে। এই বিস্ফোরণে বহিরাবরণ ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায় এবং মূল অংশ অবশিষ্ট থাকে মাত্র। অবশিষ্ট এই মূল অংশের ভর অনুসারে কোনোটি নিউট্রন তারকা (Neutron star) আবার কোনোটি কৃষ্ণ বা কাল বিবর (black hole)-এ পরিণত হয়।

কাজ : একটি নক্ষত্রের মৃত্যু কীভাবে হবে ?

জেনে রাখ : লাল দানব তারা কীভাবে কৃষ্ণবিবরে পরিণত হচ্ছে তা লক্ষ কর। এদের ব্যাস কীভাবে সংকুচিত হচ্ছে তা নিচের চিত্রে দেখ।

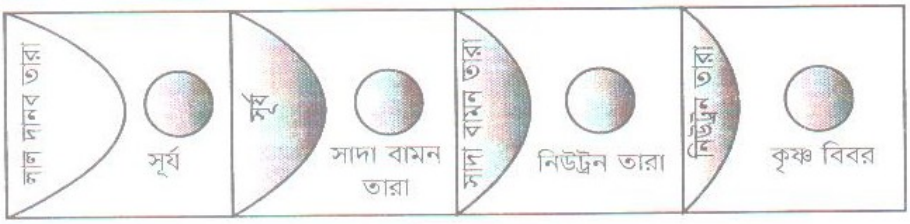

চিত্র ১১·৯

সবচেয়ে ছোট তারা সবচেয়ে বড় তারার চেয়ে দশ কোটি ভাগ ছোট। তারার ভর 1 সূর্য ভর হলে বিভিন্ন তারার ব্যাস কত হবে ?

লাল দানব	:	14 কোটি কি. মি.
সূর্য	:	14 লক্ষ কি. মি.
সাদা বামন	:	13 হাজার কি. মি.
নিউট্রন তারা	:	16 কি. মি.
ব্ল্যাকহোল	:	2.5 কি. মি.

সুতরাং তারকার মৃত্যু পর্ব কয়েকটি ধাপে ঘটতে পারে। এই ধাপগুলো নির্ভর করে মৃত্যু পর্ব শুরুর সময়ের ভর অনুসারে। যৌবন পর্বের ভর বিবেচনা করা হয় না এ কারণে যে তারকা রক্তিম দৈত্য হিসেবে, অথবা সুপারনোভার মধ্যে কিংবা নেবুলা গ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে ভর হারায়। ধাপগুলো হলো—

১। যে সমস্ত তারকার ভর সূর্যের ভর অপেক্ষা 1·4 গুণ কম সেগুলো শ্বেত বামন (white dwarf) হবে। শ্বেত বামন আস্তে আস্তে তাপীয় শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে স্তিমিত হয়ে কালো বামন (black dwarf) হবে এবং জীবন চক্র শেষ করবে।

২। যে সমস্ত তারকার ভর 1·4 Mo (Mo হলো সূর্যের ভর) এবং 3 Mo-এর মধ্যে সেগুলো নিউট্রন তারকায় পরিণত হবে।

৩। যে সমস্ত তারকার ভর 3 Mo-এর চেয়ে বেশি সেগুলো কালো বিবর (black hole)-এ পরিণত হবে।

উপরে বর্ণিত তিনটি ধাপের তারকাগুলোর যৌবনকালীন ভর হয়ত অনেক বেশি থাকতে পারে। তারপর মৃত্যু পর্ব শুরুর আগে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তারকা ভর হারাতে বা কমাতে পারে। যদি কোনো তারকা যৌবন কালীন ভর কমাতে না পারে এবং মৃত্যুপর্ব শুরুর মুহূর্তে 1·4 Mo-এর বেশি ভর থাকে, তবে কোনো ভাবেই এটি শ্বেত বামন হতে পারবে না। এই 1·4 Mo ভরের সীমাকেই **চন্দ্রশেখর সীমা** (Chandrasekhar limit) বলে। চন্দ্রশেখরের আগে জ্যোতির্পদার্থবিদদের ধারণা ছিল যে সকল ভরের নক্ষত্রই শ্বেত বামন হিসেবে জীবন চক্র শেষ করবে। কিন্তু ভারতীয় বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ চন্দ্রশেখর গাণিতিক মডেলের সাহায্যে দেখান যে 1·4 Mo ভরের বেশি ভরের কোনো নক্ষত্র শ্বেত বামন হবে না।

নিউট্রন তারকা
Neutron star

সুপারনোভা বিস্ফোরণের পর মূল অংশের ভর যদি 1·4 Mo-এর বেশি এবং 3 Mo-এর কম হয় তবে মহাকর্ষজনিত কেন্দ্রমুখী আকর্ষণ বলের জন্য মূল অংশ এতটা সঙ্কোচিত হয় যে ইলেকট্রন ও প্রোটন নিম্নের বিক্রিয়ায় নিউট্রন গঠন করে।

$$p^+ + e^- \longrightarrow n + \gamma$$

এভাবে নিউট্রন গ্যাস উৎপন্ন হয়। সঙ্কোচনের ফলে মূল অংশের ঘনত্ব যখন 10^{19} kg/m^3 মানে পৌঁছায় তখন নিউট্রন ডিজেনারেট (Neutron degenerate) অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং নিউট্রন কঠিন পদার্থের দেওয়ালের মতো আচরণ করে। এই অবস্থায় নিউট্রন সঙ্কোচন প্রক্রিয়াকে বাধা প্রদান করে। অর্থাৎ নিউট্রন গ্যাস বহির্মুখী চাপ সৃষ্টি করে এবং

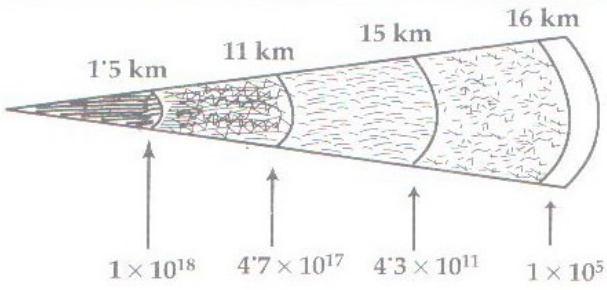

চিত্র ১১·১০

এই চাপের দ্বারা মহাকর্ষীয় সঙ্কোচনকে প্রতিহত করে সুস্থিত (stable) অবস্থায় আসে। একেই নিউট্রন তারকা বলে। চিত্র ১১·১০-এ একটি 1·4 Mo ভরের বেশি নিউট্রন তারকার কেন্দ্র থেকে বহির্মুখী বিভিন্ন অংশের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের সাপেক্ষে দেখানো হয়েছে। নিউট্রন তারকাটির ভর সূর্যের ভরের চেয়ে 1·4 গুণের বেশি হলেও এর ব্যাসার্ধ মাত্র 16 km

(সূর্যের ব্যাসার্ধ 7,00,000 km!)। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে নিউট্রন তারকা দ্রুত ঘূর্ণন গতিসম্পন্ন এবং এর অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। নিউট্রন তারকা থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বেতার স্পন্দন (radio pulse) পাওয়া যায়। তাই একে পালসার (pulsar) বলে।

কৃষ্ণ বিবর
Black hole

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গাণিতিক মডেলের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে একটি নক্ষত্রের মৃত্যু পূর্ব ভর 3 Mo-এর বেশি হলে নক্ষত্রটির ভেতরে মহাকর্ষ বলের কারণে সঙ্কোচন ক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং আমাদের জানামতে এমন কোনো শক্তি নেই যে এর অব্যাহত সঙ্কোচন প্রতিহত করতে পারে। এভাবে সঙ্কোচিত হয়ে এটি শূন্য ব্যাসার্ধ এবং অসীম ঘনত্বের বিন্দু বস্তুতে পরিণত হতে পারে। বস্তুটি বিন্দু হোক বা না হোক এর আকর্ষণ বল এত বৃদ্ধি পাবে যে এর আশেপাশে থেকে কোনো কিছুই এমনকি আলোও বেরিয়ে আসতে পারবে না। **বস্তুটি এবং এর আশেপাশে যে অঞ্চল থেকে কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়, যেখান থেকে আলো বা কোনো বস্তু বেরিয়ে আসতে পারে না ঐ অঞ্চলকে কৃষ্ণ বিবর বা গহ্বর (black hole) বলে।** এই অঞ্চলের সীমাকেই বলা হয় **ঘটনা দিগন্ত** (Event horizon)। কার্ল শোয়ার্জশিল্ড (Karl Schwarzchild) আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে 1916 খ্রিস্টাব্দে কালো বিবরের ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ R_s-এর রাশিমালা নির্ণয় করেন :

$$R_s = \frac{2GM}{c^2},$$ এখানে M হলো বস্তুর ভর, c আলোর বেগ এবং G মহাকর্ষীয় ধ্রুবক।

অর্থাৎ M ভরবিশিষ্ট অঘূর্ণনশীল কোনো গোলকীয় বস্তুর ব্যাসার্ধ যদি R_s হয় তাহলে কোনো বিন্দুই এই বস্তুপৃষ্ঠ হতে মুক্ত হতে পারবে না এবং বস্তুটি কৃষ্ণবিরব হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে R_s ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনো বস্তু থাকলে কৃষ্ণবিরবের মহাকর্ষ আকর্ষণ দ্বারা আটকা পড়বে এবং বস্তুটি থেকে মুক্ত হতে পারবে না এবং বস্তুটি কৃষ্ণ বিবর হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে R_s ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনো বস্তু থাকলে কৃষ্ণবিবরের মহাকর্ষ আকর্ষণ দ্বারা আটকা পড়বে এবং তা কোনো দিনই মুক্ত হতে পারবে না।

তাঁর নামানুসারে এই ব্যাসার্ধ শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ বলে। একে সংকট ব্যাসার্ধও বলা হয়। এই ব্যাসার্ধ শুধুমাত্র বস্তুটির ভরের উপর নির্ভর করে। 5 Mo ভরের একটি কৃষ্ণ বিবরের ব্যাসার্ধ হবে প্রায় 15 km। অর্থাৎ 15 km ব্যাসার্ধের ভেতরে কোনো কিছুই দেখা যাবে না এবং আলোসহ কোনো কিছুই বেরিয়ে আসতে পারবে না। তবে কৃষ্ণ বিবরের উপস্থিতি অনুভব করা যাবে। সূর্য যদি বর্তমান আকার থেকে সঙ্কোচনের মাধ্যমে 3 km ব্যাসার্ধে পৌঁছায় তবে এটি আমাদের কাছে অদৃশ্য মনে হবে। কিন্তু এর অভিকর্ষীয় প্রভাব থেকে যাবে। যেমন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তখনও ঘুরবে। "Seeing is believing" এই প্রবাদ তখন খাটবে না। তবে সূর্য কৃষ্ণ বিবর হবে না কেননা এর ভর অনেক কম।

1974 খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **স্টিভেন হকিং** (Steven Hawking) তত্ত্বীয় ভাবে দেখান যে কৃষ্ণ বিবর কণা নির্গমনের উৎস হতে পারে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে কৃষ্ণ বিবরে সে সমস্ত বস্তু পতিত হয় সেগুলো আবার মহাবিশ্বের অন্য কোথাও বা অন্য কোনো মহাবিশ্বে আবির্ভূত হয়। একে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাবনার কথাও অনেকে বলেছেন। সুতরাং, কৃষ্ণ বিবর আগামী দিনের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক অনেক গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছে নিঃসন্দেহে।

হিসাব কর : একটি নক্ষত্রের ভর 5 Mo। নক্ষত্রটি কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হলে কৃষ্ণ বিবরের ব্যাসার্ধ কত হবে ? [সূর্যের ভর $M = 1{\cdot}99 \times 10^{30}$ kg]

১১·৪ মহাকাশ পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত যন্ত্রের মূলনীতি
Principles of the instruments used for observing the space

মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য এবং মহাবিশ্বের পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। এছাড়া মহাবিশ্বে অবস্থিত মূল বস্তু ও নানাবিধ ঘটনা পর্যবেক্ষণ তাদের গতিবিধি অবলোকন এবং গঠন পর্যালোচনা ও প্রকৃতি জানতে বিজ্ঞানীরা অবিরাম পরিশ্রম করে যাচ্ছে। যেসব বিজ্ঞানী মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণা করেন তাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলে। আগের দিনে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খালি চোখে আকাশ দেখতেন। পরবর্তীতে বিশাল এবং শক্তিশালী দূরবিন নিয়ে তারা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু সব নক্ষত্র, গ্রহ এবং উপগ্রহ দূরবিন দিয়ে দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রয়োজন হয় নানাবিধ বৈজ্ঞানিক কৌশল ও যন্ত্রের। তাদের মধ্যে অন্যতম রেডিও টেলিস্কোপ, অপটিক্যাল টেলিস্কোপ, গামা ও এক্স-রে এবং কৃত্রিম উপগ্রহের, সেগুলো কতগুলি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাজে ব্যবহৃত এই সকল উপকরণের (টেলিস্কোপের) মূলনীতিসহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো :

রেডিও টেলিস্কোপ
Radio Telescope

রেডিও টেলিস্কোপ এক ধরনের দিক নির্দেশী (Directional) বেতার এ্যান্টেনা যা বেতার জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত হয়। একই ধরনের এ্যান্টেনা উপগ্রহ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ এবং মহাকাশ গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। জ্যোতির্বিদ্যায় ভূমিকার ক্ষেত্রে রেডিও টেলিস্কোপ অপটিক্যাল টেলিস্কোপ থেকে আলাদা কারণ রেডিও টেলিস্কোপ তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালীর বেতার কম্পাংক অংশ ব্যবহার করে। বেতার, টেলিভিশন এবং রাডার হতে নির্গত তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সঙ্গে যাতে ব্যতিচার না ঘটে এজন্য রেডিও টেলিস্কোপগুলোকে লোকালয় থেকে দূরে স্থাপন করা হয়। এরিকিবো মানমন্দিরে ব্যবহৃত রেডিও টেলিস্কোপটি জগৎ বিখ্যাত এবং সংবেদনশীল। বর্তমানে ব্যবহৃত ডিস এন্টেনা হলো রেডিও টেলিস্কোপের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

বেতার বর্ণালী তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালীর একটা বড় পরিসর জুড়ে অবস্থান করে (3kHz–300GHz)। এর অর্থ রেডিও টেলিস্কোপে যে ধরনের এ্যান্টেনা ব্যবহৃত হয় সেগুলোর নকশা, আকার এবং বিন্যাসের দিক থেকে বেশ ভিন্নতর। তারা, নক্ষত্র, কোয়াজার ও অন্যান্য জ্যোতি পদার্থ থেকে প্রাকৃতিকভাবে নির্গত বেতার নির্গমন অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করার জন্য রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহৃত হয়। রেডিও টেলিস্কোপ উপরোক্ত বস্তুগুলোর প্রতিবিম্বও গঠন করতে পারে।

মূলনীতি (Principle of operation)

এই যন্ত্রের মৌলিক কার্যনীতি দৃশ্যমান তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ব্যবহৃত প্রতিফলন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতোই। আপতিত তরঙ্গ, তা বেতার বা দৃশ্যমান যা-ই হোক না কেন, একটি নিখুঁত দর্পণে বাধাগ্রস্ত হয়ে একটি সাধারণ অভিসারী বিন্দুতে মিলিত হয়। এক্ষেত্রে প্রতিফলন পৃষ্ঠতল এবং আপতিত তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৈশিষ্ট্যগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিফলন পৃষ্ঠতলের আকৃতি এমন হতে হবে যেন বেতার তরঙ্গগুলো সেখান থেকে প্রতিফলনের পর অভিসারী বিন্দুতে একই দশায় মিলিত হতে পারে। এর জন্য প্রতিফলন বিন্দু থেকে অভিসারী বিন্দু পর্যন্ত পথের দৈর্ঘ্য পৃষ্ঠতলের বিভিন্ন বিন্দুতে একই হতে হবে। এই শর্ত অবশ্য সহজেই মেটানো যায়, কেবল প্রতিফলন পৃষ্ঠতলটি পরাবৃত্ত আকৃতির করে দিলেই হলো। এজন্যেই আধুনিক বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রগুলোর প্রতিফলন পৃষ্ঠতল তথা ডিশের আকৃতি পরাবৃত্তীয় হয়ে থাকে। এছাড়া এ ধরনের দূরবীক্ষণের দর্শন তথা পর্যবেক্ষণের কাজটি 1 মিমি থেকে 30 মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে করতে হয়। কারণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য 30 মিটারের বেশি হলে আয়নমণ্ডলে শোষণ ঘটে আর 1 মিলিমিটারের চেয়ে কম হলে বায়ুমণ্ডলের পানি, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং ওজোন কর্তৃক শোষিত হয়।

এভাবে অভিসারী বিন্দুতে বেতার তরঙ্গগুলোকে একত্রিত করা হলেও সেগুলো সাধারণত খুবই ক্ষীণ থাকে। এদেরকে পর্যবেক্ষণের উপযোগী করতে হলে বিবর্ধিত করতে হয়। প্রথমে আপতিত এবং অভিসারী বিন্দুতে একত্রিত বেতার কম্পাঙ্ক সংকেতকে অভিসারী বিন্দুতে 10 থেকে 1000 গুণ বিবর্ধিত করা হয়। এই বিবর্ধিত কম্পাঙ্ককে তাদের ক্ষুদ্রতর কম্পাঙ্কে পরিবর্তিত করা হয় যাকে মধ্যবর্তী কম্পাঙ্ক বলা হয়। এই মধ্যবর্তী কম্পাঙ্ককে সহজেই তারের মাধ্যমে অভিসারী বিন্দু থেকে দূরবীক্ষণ নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠানো যায়। এখানে মধ্যবর্তী কম্পাঙ্ককে আরও বর্ধিত করা হয় যাতে সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই স্পষ্ট কম্পাঙ্ককে এমনভাবে তথ্যপ্রদর্শনী যন্ত্রে প্রদর্শন করা হয় যার মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণ কাজে সর্বোচ্চ উপযোগিতা লাভ করতে পারেন। ১১·১১ চিত্রে রেডিও টেলিস্কোপ দেখানো হলো।

চিত্র ১১.১১ : রেডিও টেলিস্কোপ।

অপটিক্যাল টেলিস্কোপ
Optical Telescope

অপটিক্যাল টেলিস্কোপে সরাসরি বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব দেখা, আলোকচিত্র নেয়া এবং উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালীর প্রধানত দৃশ্যমান অংশ সংগ্রহ এবং নিবন্ধ করে। অপটিক্যাল টেলিস্কোপ প্রধানত তিন ধরনের–

(১) প্রতিসারক— লেন্স ব্যবহৃত হয়।
(২) প্রতিফলক— আয়না ব্যবহৃত হয়।
(৩) ক্যাটাডায়প্ট্রিক— লেন্স এবং আয়না উভয়ই ব্যবহৃত হয়।

পর্যবেক্ষণীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান, পক্ষিবিজ্ঞান, শত্রুপক্ষের অবস্থান নির্ণয় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে অপটিক্যাল টেলিস্কোপ ব্যবহৃত হয়।

মূলনীতি (Principle of operation)

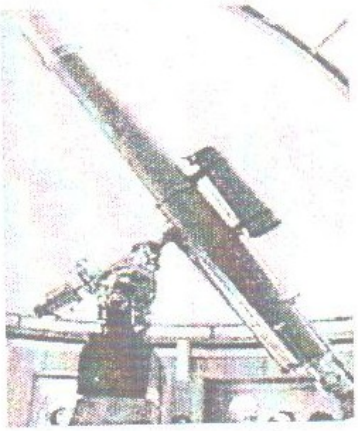

চিত্র ১১.১২ : অপটিক্যাল টেলিস্কোপ।

অপটিক্যাল টেলিস্কোপে আগত রশ্মিগুলোকে বস্তু লেন্সের সাহায্যে একত্রিত করে টেলিস্কোপের ভেতর প্রেরণ করে। রশ্মিগুলো একত্রিত করার কাজটি টেলিস্কোপের সামনে লাগানো বস্তু লেন্স (উত্তল লেন্স বা অবতল দর্পণ) সম্পন্ন করে। দূর থেকে আগত আলোক রশ্মি ফোকাস তলের একটি বিন্দুতে মিলিত হয়ে বস্তুর বাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। এই প্রতিবিম্ব বা ইমেজ চক্ষু লেন্সের দ্বারা বিবর্ধিত চোখে এসে পড়ে এবং লক্ষ্যবস্তুর বিবর্ধিত বাস্তব প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। এখানে চক্ষু লেন্স বিবর্ধিত কাঁচের (Magnifying glass) ন্যায় কার্য সম্পন্ন করে। এটাই অপটিক্যাল লেন্সের মূলনীতি। ১১.১২ চিত্রে অপটিক্যাল টেলিস্কোপ দেখানো হলো।

গামা রে টেলিস্কোপ
Gamma Ray Telescope

আমরা জানি, তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক/তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রসার অত্যন্ত বেশি। তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য অনুসারে বহু আগে থেকেই বিভিন্ন নামকরণ প্রচলিত আছে। যেমন, রেডিও তরঙ্গ, অবলোহিত তরঙ্গ, দৃশ্যমান তরঙ্গ, এক্স-রশ্মি, গামা রশ্মি ইত্যাদি। গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর 10^{-11}m থেকে 10^{-15}m পর্যন্ত বিস্তৃত। তড়িৎ চৌম্বকীয় বর্ণালীর সবচেয়ে শক্তিশালী ফোটন দ্বারা গামা রশ্মি গঠিত। এই ফোটনের শক্তি 10^{7} eV থেকে 10^{15} eV পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে এর ভেদন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। পারমাণবিক নিউক্লিয়াস থেকে গামা রশ্মি বিকিরণ ১১.১৩ চিত্রে দেখানো হলো।

গামা রশ্মি নিঃসরণের উৎসসমূহ নিম্নরূপ :

(i) পরমাণুর নিউক্লিয়াস উত্তেজিত হয়ে উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে স্থানান্তরের ফলে এ রশ্মি নির্গত হয়।

(ii) তেজস্ক্রিয় পরমাণুর বিশ্লেষণের (disintegration) সময় এ রশ্মি নির্গত হয়।

(iii) মহাবিশ্বে সবচেয়ে উত্তপ্ত এবং শক্তিশালী বস্তুসমূহে বিভিন্ন বিক্রিয়ার কারণে গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়। যেমন—নিউট্রন নক্ষত্র, পালসার (Pulsar), সুপারনোভা বিস্ফোরণ, কৃষ্ণ বিবরের পরিপার্শ্বে ইত্যাদি।

গামা-রে টেলিস্কোপ গামা রশ্মি বিকিরণকে চিহ্নিত ও পর্যবেক্ষণ করতে পারে। মহাজাগতিক গামা রশ্মি বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহাশূন্যে সংঘটিত বিভিন্ন প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক ঘটনা (Violent events) ও উৎসগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

প্রতিটি তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস হতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক গামা রশ্মি নিসৃত হয়; সুতরাং নিসৃত বিকিরণ দ্বারা উক্ত নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থ সনাক্ত করা সম্ভব। মহাবিশ্বের নক্ষত্র, ছায়াপথসমূহ হতে আগত গামা রশ্মি পর্যবেক্ষণ করে নির্দিষ্ট মৌলিক পদার্থের উপস্থিতি এবং নির্দিষ্ট নিউক্লিয় ঘটনাবলির অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়।

মূলনীতি (Principle of operation) :

গামা-রে টেলিস্কোপ সাধারণ টেলিস্কোপের মতো নয়। আলো বা এক্স রশ্মির মতো সাধারণ দর্পণে গামা রশ্মি ধরা যায় না। গামা রশ্মির ভেদনক্ষমতা অনেক বেশি হওয়ায় দর্পণের ভেতর দিয়ে চলে যায় এবং শোষণ বা প্রতিফলন ঘটায় না। গামা রশ্মি সনাক্তকরণের জন্য এক বিশেষ ধরনের ডিটেকটর (detector) ব্যবহার করা হয় যাকে সিন্টিলেশন ডিটেকটর (Scintillation detector) বলা হয়। এই ডিটেকটরের ভেতরে ঘন সন্নিবিষ্ট স্ফটিক (Crystal)-এর ব্লক থাকে। গামা রশ্মি যখন এই স্ফটিকে প্রবেশ করে তখন এর ইলেকট্রনের সাথে সংঘর্ষ হয় এবং চার্জিত কণা সৃষ্টি হয়। এই চার্জিত কণা ডিটেকটরের সেন্সরে ধরা পড়ে এবং প্রতিবিম্ব তৈরি করে। কম্পটন বিক্ষেপ টেলিস্কেপ (Compton Scatter Telescope) এ ধরনের একটি গামা-রে টেলিস্কোপ।

চিত্র ১১.১৩ : পারমাণবিক নিউক্লিয়াস থেকে গামা বিকিরণ।

এক্স-রে টেলিস্কোপ
X-ray Telescope

মহাকাশে সংঘটিত বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক (violent) ঘটনা থেকে এক্স-রে নির্গত হয়। যেমন কোনো নক্ষত্রের বিস্ফোরণে প্রচণ্ড তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এক্সরে নির্গত হয়। এক্স-রে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এবং উচ্চ শক্তির তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ। এক্স-রে টেলিস্কোপ এসব এক রশ্মি পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বেশির ভাগ মহাজাগতিক এক্স-রশ্মি শোষিত হয় বলে এক্স-রে টেলিস্কোপ কৃত্রিম উপগ্রহ, রকেট বা বেলুনে স্থাপন করে বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত এক্স রশ্মি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এক্স-রে অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় সাধারণ দর্পণের ভেতর দিয়ে সহজেই চলে যেতে পারে, তাই এক্স-রে টেলিস্কোপে এক্স-রে চিহ্নিত করার জন্য ধাতব দর্পণ ব্যবহার করা হয়। টেলিস্কোপে দর্পণগুলো এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে এক্স রশ্মি অতি ক্ষুদ্র কোণে আপতিত ও প্রতিফলিত হয় যেমন কোনো পাতলা গুড়ি পাথর পুকুরের পানির উপর অতি অল্প কোণে নিক্ষেপ করলে পানির তলকে স্পর্শ করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

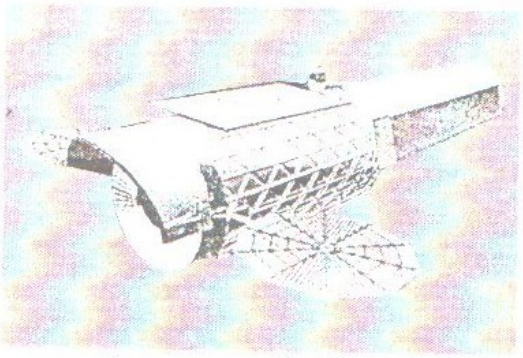

চিত্র ১১·১৪ : এক্স রশ্মি টেলিস্কোপ।

মূলনীতি (Principle of operation) : এক্স-রে টেলিস্কোপে ধাতব নির্মিত দর্পণ ব্যবহার করা হয়। মহাজাগতিক বস্তু থেকে আগত এক্স রশ্মি যাতে টেলি-স্কোপের দর্পণে শোষিত না হয় সেজন্য দর্পণের পৃষ্ঠগুলো স্বর্ণ বা ইরিডিয়ামের পাতলা স্তর দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। এক্স-রশ্মিকে দর্পণ তলে অতিক্ষুদ্র কোণে আপতিত ও প্রতিফলিত করা হয়। প্রতিফলিত এক্স রশ্মি ফোটন ডিটেকটরে সংগ্রহ করা হয়। ডিটেকটর শোষিত ফোটনের শক্তি, সময়, দিক রেকর্ড করে। ফটো ডায়োড চার্জড কাপলড ডিভাইস (Charged Coupled Device)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়। সংগৃহীত উপাত্ত থেকে মহাজাগতিক পরিবেশের গঠন এবং অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। চিত্র ১১·১৪-এ একটি এক্স-রে টেলিস্কোপ দেখানো হয়েছে।

১৯৯৯ সালে স্থাপিত চন্দ্র (Chandra) নামে একটি মহাকাশ এক্স-রে টেলিস্কোপ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই টেলিস্কোপ ছায়াপথের বিভিন্ন নক্ষত্র, নিউট্রন তারকা, কৃষ্ণ গহ্বরের ছবি প্রেরণ করে নতুন নতুন তথ্য সরবরাহ করছে।

কৃত্রিম মহাকাশ গবেষণায় কৃত্রিম উপগ্রহ
Artificial satellite in space research

কৃত্রিম উপগ্রহ হলো মানুষ নির্মিত মহাকাশযান যা রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণের পর নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৃথিবীর চারদিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে [চিত্র ১১.১৫] জোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা, মহাজাগতিক বস্তু নিঃসৃত রশ্মি ও বিকিরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে কৃত্রিম উপগ্রহ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অনেক উপরে বিশেষ ধরনের টেলিস্কোপ স্থাপন করে মহাজাগতিক বস্তু পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করা যায়। হাবল টেলিস্কোপ, এক্স-রে টেলিস্কোপ, গামা-রে টেলিস্কোপ এ ধরনের টেলিস্কোপ। 1990 সালে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ (Hubble Space Telescope) পৃথিবী হতে 600 km উচ্চতায় কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপন করা হয়। এই টেলিস্কোপ মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্র, গ্যালাক্সির স্পষ্ট চিত্র পৃথিবীতে প্রেরণ করছে যা পর্যালোচনা করে মহাবিশ্বের বয়স, কৃষ্ণ গহ্বর ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক নতুন নতুন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারণশীল তা হাবল টেলিস্কোপ প্রেরিত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রমাণিত হয়েছে।

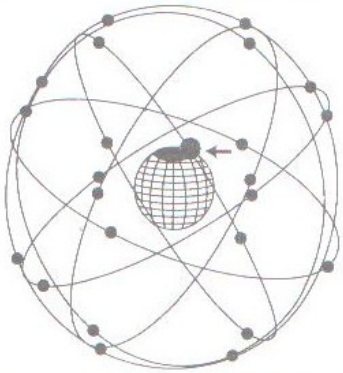

চিত্র ১১·১৫ : কৃত্রিম উপগ্রহের ঘূর্ণনের কক্ষপথ।

মূলনীতি (Principle of operation) : কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ বেগসম্পন্ন রকেটের সাহায্য নেওয়া হয়। বায়ুর বাধা এড়ানোর জন্য এই রকেট দিয়ে উপগ্রহকে কয়েকশ' কিলোমিটার উপরে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ এমনভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণায়মান হয় যাতে ঘূর্ণনের জন্য

প্রয়োজনীয় কেন্দ্রমুখী বল এটি পৃথিবীর অভিকর্ষীয় বল হতে পায়। কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ এবং পর্যায়কাল নিম্নের সমীকরণ থেকে নির্ণয় করা যায়।

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{GM}{R+h}}$$

এবং $$T = 2\pi (R+h)\sqrt{\frac{R+h}{GM}}$$

এখানে R = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, M = পৃথিবীর ভর, h = পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে উপগ্রহের উচ্চতা, G = মহাকর্ষ ধ্রুবক

কৃত্রিম উপগ্রহের বেগ এবং পর্যায়কাল তার ভরের উপর নির্ভরশীল নয়।

গাণিতিক উদাহরণ

১। একটি নক্ষত্রের ভর 4 M_0। নক্ষত্রটি যদি কৃষ্ণ বিবরে রূপান্তরিত হয় তবে এর শোয়ার্জশিল্ড বা সংকট ব্যাসার্ধ কত হবে ? (সূর্যের ভর $M_0 = 1{\cdot}99 \times 10^{30}$ kg)

আমরা জানি,

শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ,

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}$$

$$= \frac{2 \times 6{\cdot}67 \times 10^{-11}\ Nm^2\ kg^{-2} \times 4 \times 1{\cdot}99 \times 10^{30}\ kg}{(3 \times 10^8\ ms^{-1})^2}$$

$$= 11{\cdot}80 \times 10^3\ m$$

$$= 11{\cdot}80\ km$$

এখানে,

$M = 4\ M_0$

$M_0 = 1{\cdot}99 \times 10^{30}$ kg

২। জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ থেকে জানা যায় যে, ভস্মীভূত নক্ষত্র এর নিজের মহাকর্ষের প্রভাবেই ধ্বংস হয়ে কৃষ্ণ বিবরে রূপ নিতে পারে। তবে এজন্য এর ভর হতে হবে দুই সৌর ভরের সমান। (সূর্যের ভর = 2×10^{30} kg হলো এর সৌর ভর)। এ রকম ক্ষেত্রে ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ কত ?

আমরা জানি,

$$R_s = \frac{2GM}{c^2}$$

$$= \frac{2 \times 6{\cdot}67 \times 10^{-11} \times 4 \times 10^{30}}{(3 \times 10^8)^2}$$

$$= 5{\cdot}93 \times 10^3\ m$$

$$= 5{\cdot}93\ km$$

এখানে,

নক্ষত্রের ভর,

$M = 2 \times$ সূর্যের ভর

$= 2 \times 2 \times 10^{30}$ kg

$= 4 \times 10^{30}$ kg

ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ, $R_s = ?$

প্রয়োজনীয় গাণিতিক সূত্রাবলি

$v = Hd$, V = বেগ, H = হাবল ধ্রুবক, d = দূরত্ব ... ... (1)

$m_2 - m_1 = 5 \log \frac{d_2}{d_1}$, d_1, d_2 = দুটি তারার মধ্যবর্তী দূরত্ব; m_1, m_2 তারা দুটির ঔজ্জ্বল্য ... (2)

$R_s = \frac{2GM}{C^2}$, R_s = সংকট ব্যাসার্ধ, M = নক্ষত্রের ভর, M_0 = সূর্যের ভর ... ... (3)

$\frac{v}{c} = \frac{\Delta l}{l}$, Δl = বিচ্যুতি, l = আদি বর্ণালী রেখার দৈর্ঘ্য, c = আলোর বেগ, v = তারার বেগ ... (4)

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{GM}{R+h}} \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (5)$$

$$T = 2\pi(R+h)\sqrt{\frac{R+h}{GM}} \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (6)$$

উচ্চতর দক্ষতাসম্পন্ন নমুনা গাণিতিক উদাহরণ

১। রুবেল হাইড্রোজেন বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেল কোনো তারার হাইড্রোজেন বর্ণালী রেখা $486{\cdot}1 \times 10^{-9}$ মি. থেকে $485{\cdot}7 \times 10^{-9}$ মি. এ বিচ্যুত হয়েছে।

(ক) তারাটি দর্শকের দিকে এগোচ্ছে নাকি দূরে সরে যাচ্ছে?

(খ) কত বেগে এগুচ্ছে ?

(ক) এখানে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ, তা বর্ণালীর নীল অঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায় তারাটি দর্শকের দিকে এগোচ্ছে।

(খ) ডপলারের সমীকরণ থেকে আমরা জানি,

$$\frac{v}{c} = \frac{\Delta l}{l} = \frac{486{\cdot}1 \times 10^{-9} - 485{\cdot}7 \times 10^{-9}}{486{\cdot}1 \times 10^{-9}}$$

$$\therefore \quad v = \frac{0{\cdot}4 \times 10^{-9}}{486{\cdot}1 \times 10^{-9}} \times 3 \times 10^{8} \text{ কি.মি./সে.}$$

$$= 249 \text{ কি.মি./সে. বেগে}$$

২। হাবলের সূত্র থেকে আমরা জানি গ্যালাক্সিসমূহ পরস্পর হতে দূরে সরে যাচ্ছে, এই সরে যাবার দ্রুতি এদের মধ্যকার দূরত্বের সমানুপাতিক। এক্ষেত্রে সমানুপাতিক ধ্রুবক হাবল ধ্রুবকের সমান। এই তথ্যের আলোকে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গবেষণা করছিলেন।

(ক) হাবল ধ্রুবকের মান $H = 2{\cdot}3 \times 10^{-18}\ s^{-1}$ এবং কোয়াসের দূরে সরে যাবার দ্রুতি $2{\cdot}8 \times 10^{8}\ ms^{-1}$ হলে কোয়াসটির আনুমানিক দূরত্ব নির্ণয় কর।

(খ) জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নির্ণয়কৃত বয়স কত হতে পারে এবং তা কতটুকু নিখুঁত হবে? গাণিতিকভাবে তোমার ধারণা ব্যক্ত কর।

(ক) আমরা জানি, $v = Hr$

$$\therefore \quad r = \frac{v}{H} = \frac{2{\cdot}8 \times 10^{8}\ ms^{-1}}{2{\cdot}3 \times 10^{-18}\ s^{-1}}$$

$$= 1{\cdot}217 \times 10^{26}\ m$$

এখানে,

উদ্দীপক মতে $v = 2{\cdot}8 \times 10^{8}\ ms^{-1}$

হাবল ধ্রুবক, $H = 2{\cdot}3 \times 10^{-18}\ s^{-1}$

দূরত্ব, $r = ?$

(খ) হাবলের সূত্র ব্যবহার করে মহাজগতের বয়স নির্ধারণ করতে হলে সর্বাধিক দূরে অবস্থিত জ্যোতিষ্কের সরে যাওয়ার দ্রুতি নির্ণয় করতে হবে।

উদ্দীপকের হিসাব মতে, সর্বোচ্চ দ্রুতি,

$v_{max} = 3 \times 10^{8}\ ms^{-1}$

∴ পৃথিবী হতে সর্বাধিক দূরে অবস্থিত জ্যোতিষ্কের দূরত্ব

$$r_{max} = \frac{v_{max}}{H} = \frac{3 \times 10^{8}}{2{\cdot}3 \times 10^{-18}} = 1{\cdot}3043 \times 10^{26}\ m$$

∴ উদ্দীপকে উল্লেখিত নির্ণয়কৃত মহাবিশ্বের বয়স

$$= \frac{v_{max}}{\text{শূন্যস্থানে আলোর দ্রুতি}} = \frac{1{\cdot}3043 \times 10^{26}}{3 \times 10^{8}}$$

$$= 4{\cdot}3478 \times 10^{17}\ sec$$

$$= 5{\cdot}03220 \times 10^{12}\ sec$$

$$= 14 \times 10^{9}\ years$$

নির্ণয়কৃত এই বয়স নিখুঁত হবে না। কারণ এক্ষেত্রে হাবল গোলকের অভ্যন্তরে অবস্থিত জ্যোতিষ্কসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে। এর বাইরে অবস্থিত জ্যোতিষ্কসমূহ বিবেচনা করা হয়নি। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি এই মহাবিশ্ব সসীম না অসীম। মহাবিশ্ব অসীম হলে নির্ণীত বয়স কোনোক্রমেই সঠিক নয়।

৩। ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার প্রফেসর ডগলাস জেমস্ দুজন ছাত্র নিয়ে মহাবিশ্বের ভবিষ্যতের উপর গবেষণা করছিলেন। একজন ছাত্রের অভিমত হলো মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। এক সময় এই প্রসারণ থেমে যাবে এবং সংকোচন শুরু হবে। অন্য ছাত্রের অভিমত মহাবিশ্বের প্রসারণ অনন্তকাল ধরে চলবে। প্রথম ছাত্র গবেষণা করে জানতে পেরেছিল কোনো একটি কৃষ্ণ গহ্বরের ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ 5·9 km। উক্ত কৃষ্ণ গহ্বরের ভর ও পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছিল।

(ক) উদ্দীপকে বর্ণিত কৃষ্ণগহ্বরের ভর কত ছিল?

(খ) উদ্দীপকে মহাবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে যে কোনো ছাত্রের সমর্থনে পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে তোমার যুক্তি দেখাও।

(ক) আমরা জানি, মহাকর্ষ ধ্রুবক, $G = 6{\cdot}673 \times 10^{-11}\ Nm^2\ kg^{-2}$

আলোর বেগ, $c = 3 \times 10^8\ ms^{-1}$

ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ, $R_s = 5{\cdot}9\ km = 5{\cdot}9 \times 10^3\ m$

কৃষ্ণ গহ্বরের ভর, $M = ?$

আমরা জানি, $R_s = \frac{2GM}{c^2}$

$$\therefore\ M = \frac{R_s c^2}{2G} = \frac{5{\cdot}9 \times 10^3 \times (3 \times 10^8)^2}{2 \times 6{\cdot}673 \times 10^{-11}} = 3{\cdot}98 \times 10^{30}\ kg$$

(খ) প্রথম ছাত্রের অভিমত হলো মহাবিশ্বের প্রসারণ একদিন থেমে যাবে এবং সংকোচন শুরু হবে। এই মন্তব্যের সপক্ষে পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে সঙ্গত যুক্তি নিম্নে দেওয়া হলো।

মহা সংকোচন তত্ত্ব মতে, মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব তার সম্প্রসারণকে বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট। তাই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ কমতে কমতে এক সময় তার সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তা সংকুচিত হতে শুরু করবে। এক পর্যায়ে গোটা মহাবিশ্ব এক মাত্রাহীন সিঙ্গুলারিটিতে কলাপ্স (Collapse) করবে। আরেকটি তত্ত্বের ধারণা অনুযায়ী মহাবিশ্বের সংকোচনের পর পুনরায় মহাবিস্ফোরণ ঘটবে। তারপর আবার মহাসংকোচন ঘটবে। অর্থাৎ এই চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এই তত্ত্ব বিগ বাউন্স তত্ত্ব নামে পরিচিত।

সার-সংক্ষেপ

শ্বেত বামন : মৃত্যু পর্ব শুরুর মুহূর্তে যে সমস্ত তারকার ভর সূর্যের ভরের অপেক্ষা 1.4 গুণ কম, সেগুলো শ্বেত বামন। রক্তিম দৈত্য স্ফীতির ফলে ক্রমশ একটি ধাপে পৌঁছায় যে এর বাইরের আবরণ বিচ্ছিন্ন বা ভেঙ্গে যায়, অবশিষ্ট যা থাকে তাকে শ্বেত বামন বলে।

রক্তিম দৈত্য : তারকার হাইড্রোজেন জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে সংকোচনের ফলে তারকার মূল অংশের ঘনত্ব বাড়ে এবং তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায় এবং বহির্ভাগে প্রসারণ ঘটে। বাইরের আবরণের স্ফীতির ফলে তারকার আকার অনেক বড় হয় এবং তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় তারকার পৃষ্ঠ থেকে নির্গত আলো লালাভ দেখায়। এই তারকাকে রক্তিম দৈত্য বলে।

সুপারনোভা : সূর্যের ভরের তুলনায় অনেক ভারী নক্ষত্রগুলো জ্বালানি শেষ হলে সঙ্কোচন অত্যন্ত তীব্র হয় এবং মূল অংশের ঘনত্ব এত বেড়ে যায় যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণকে সুপারনোভা (supernova) বিস্ফোরণ বলা হয়।

কৃষ্ণ বিবর বা কৃষ্ণ গহ্বর : একটি নক্ষত্রের মৃত্যুপূর্ব ভর সূর্যের ভরের তিনগুণের বেশি হলে নক্ষত্রটির ভেতর মহাকর্ষ বলের কারণে সংকোচন ক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং এটি সংকোচিত হয়ে অসীম ঘনত্বের বিন্দু বস্তুতে পরিণত হতে পারে। এতে আকর্ষণ বল এত বৃদ্ধি পাবে যে বস্তুটির আশেপাশের অঞ্চল থেকে কোনো কিছুই এমনকি আলোও বেরিয়ে আসতে পারে না। ঐ অঞ্চলকে কৃষ্ণ গহবর বা কালো বিবর বলে।

ঘটনা দিগন্ত : কৃষ্ণ বিবর অঞ্চলের সীমাকে ঘটনা দিগন্ত বলে।

শোয়ার্জফিল্ড ব্যাসার্ধ : কালো বিবরের ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধকে শোয়ার্জফিল্ড ব্যাসার্ধ বলে।

চন্দ্রশেখর সীমা : মৃত্যুপর্ব শুরুর মুহূর্তে যদি কোনো তারকার ভর $1.4\ M_0$ এর বেশি থাকে; তবে কোনোভাবেই এটি শ্বেত বামন হতে পারবে না। এই $1.4\ M_0$ ভরের সীমাকে চন্দ্রশেখর সীমা বলে।

রেডিও টেলিস্কোপ : রেডিও টেলিস্কোপ এক ধরনের দিক নির্দেশী (Directional) বেতার এ্যান্টেনা যা বেতার জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত হয়।

গামা-রশ্মি : তেজস্ক্রিয় পদার্থ হতে নির্গত রশ্মির উপর চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে কিছু রশ্মি বামে, কিছু রশ্মি ডানে বিক্ষিপ্ত হয়। কিছু রশ্মি বিক্ষিপ্ত না হয়ে সোজা চলে যায়। এ রশ্মিকে গামা-রশ্মি বলে। গামা-রশ্মি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। এদের কোনো চার্জ নেই।

এক্স-রশ্মি : দৃশ্যমান আলোকের ন্যায় এক্স-রে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। এরা অদৃশ্য রশ্মি। এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক কম।

কৃত্রিম উপগ্রহ : মানুষ সৃষ্ট উপগ্রহকে কৃত্রিম উপগ্রহ বলে।

স্বাভাবিক উপগ্রহ : যে সব উপগ্রহ প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট তাদেরকে স্বাভাবিক উপগ্রহ বলে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলির সার-সংক্ষেপ

১। মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টির উৎপত্তিকে বিগ ব্যাং বলে।

২। পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিভিন্ন তত্ত্ব এবং মহাকাশের নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ এ সব জ্যোতিষ্কপুঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে।

৩। আলো 1 বছরে শূন্য মাধ্যমে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোক বর্ষ বলে।

৪। যে বস্তুটি এবং এর আশেপাশের যে অঞ্চল থেকে কোনো তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়, সেখান থেকে আলো বা কোনো বস্তু বেরিয়ে আসতে পারেনা ঐ অঞ্চলকে কৃষ্ণ বিবর বলে।

৫। মহাকাশের বস্তু দ্বারা নিঃসৃত তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ তাড়িতচৌম্বক বর্ণালীর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সকল পাল্লা জুড়ে থাকে। এই বিকিরণের প্রধান অংশ বায়ুমণ্ডল দ্বারা শোষিত বা প্রতিফলিত হয়। ফলে পৃথিবী শুধু দৃশ্যমান বিকিরণ ও রেডিও তরঙ্গের সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করে। বাকিটা মহাশূন্য গ্লোব নামে পরিচিত যা দৃশ্যমান নয়।

৬। আমাদের পৃথিবী, অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য, অন্যান্য নক্ষত্র এবং গ্যালাক্সি নিয়ে যে জগৎ গঠিত হয় তাকে মহাবিশ্ব বলে।

৭। গামারশ্মি এক ধরনের তাড়িতচুম্বকীয় তরঙ্গ, 1972 সালে উপগ্রহে স্থাপিত যন্ত্রে সর্বপ্রথম গামা বিকিরণ ধরা পড়ে।

৮। r দূরত্বে অবস্থিত কোনো মহাজাগতিক বস্তুর দূরে সরে যাবার বেগ v হলে গাণিতিকভাবে হাবলের সূত্র হলো $v = Hr$, H = হাবল ধ্রুবক, এর মান $H = 80\ kms^{-1}\ MPc^{-1}$ বা $2 \times 10^{-18}\ s^{-1}$।

৯। বিগ-ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ 15 বিলিয়ন বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল।

১০। শ্বেত বামন নক্ষত্রের জন্য ভরের সীমা 1·4 সৌর ভর। শ্বেত বামন নক্ষত্র এক সময় কালো বামন নক্ষত্রে পরিণত হয়।

১১। ভারতের বিজ্ঞানী সুব্রামানিয়াম চন্দ্রশেখর মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

১২। মহাকাশে এক ধরনের মহাশূন্যতা, তবে সম্পূর্ণ শূন্য নয়; সেখানে ছড়িয়ে আছে গ্যাস ও ধুলোর সুবিশাল মেঘের পর মেঘ। আকাশে মেঘলা বা কুয়াশা আকারের এদেরকেই বলা হয় নীহারিকা বা নেবুলা।

১৩। বিজ্ঞানী হাবল সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন "মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল", হাবল টেলিস্কোপ হলো বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক টেলিস্কোপ। ইহা প্রতিফলন টেলিস্কোপ নয়।

১৪। গামারশ্মি ধাতব স্তরের মধ্যে প্রবেশ করলে ইলেকট্রন ও পজিট্রন তৈরি হয়।

১৫। বেলা 5 হলো উপগ্রহ। মহাবিশ্বে যা কিছু দেখা যায় তা পরমাণু দিয়ে গঠিত।

১৬। বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যনীতি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো। মহাকাশ গবেষণায় এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।

১৭। পালসার হলো ঘূর্ণায়মান নিউট্রন নক্ষত্র। মহাবিশ্বের বয়স প্রায় 15 বিলিয়ন বছর বা 14×10^9 বছর।

১৮। মহাবিশ্বের অন্তিম পরিণতি বিষয়ে তত্ত্বগুলো হলো মহা সংকোচন, বিকরিণ, মহাহিমায়ন।

১৯। সূর্য একটি 2য় জেনারেশন নক্ষত্র, আলোক বর্ষের একক বছর। সাধারণ নক্ষত্রের জ্বালানি হলো হিলিয়াম। সূর্য একটি বামন নক্ষত্র।

২০। কৃষ্ণ বিবর সৃষ্টির কারণ মহাকর্ষ বল। কৃষ্ণ বিবরের সীমাকে বলে ঘটনা দিগন্ত। সোয়ার্জস্কাইভ ব্যাসার্ধ হলো কৃষ্ণ গহ্বরের কেন্দ্র হতে ঘটনা দিগন্ত পর্যন্ত দূরত্ব।

২১। কোয়েসার থেকে বেতার তরঙ্গ নির্গত হয়। বুধ গ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে লোহা ও নিকেল।

২২। মহাকাশে তারকার বিস্ফোরণকে সুগারনোভা বলে। এটি লোহা অপেক্ষা ভারী।

২৩। আকাশগঙ্গা সর্পিলাকার গ্যালাক্সি। হাবল বিধি অনুসারে ছায়াপথগুলোর অপসারণ বেগ দূরত্বের সমানুপাতিক হয়।

২৪। সূর্য রক্তিম দৈত্য হলে নিকটস্থ গ্রহসমূহকে গ্রাস করবে।

২৫। তারকার জন্ম হয় গ্যাস ও মেঘপুঞ্জ জমাট বাঁধার ফলে। সূর্য এখন থেকে 500 কোটি বছর পরে দানব নক্ষত্রে পরিণত হবে।

২৬। সূর্যের মধ্যে ফিউশান বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম তৈরি হচ্ছে এবং বিপুল পরিমাণে তাপ শক্তি নির্গত হচ্ছে।

২৭। যে সকল তারকার ভর সূর্যের ভর অপেক্ষা 1·4 গুণ কম সেগুলোকে শ্বেত বামন বলে এবং যাদের ভর 1·4 M_0 এবং 3 M_0 এর মধ্যে সেগুলোকে নিউট্রন তারকা বলে এবং যে সকল তারকার ভর 1·4 M_0 এর চেয়ে বেশি সেগুলো হলো ব্লাক হোল।

২৮। মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব সংকট ঘনত্বের বেশি হলে মহাসংকোচন শুরু হবে।

২৯। মেসনের স্পিন 0, বেরিয়নের স্পিন শূন্য নয়, সকল কোয়ার্কই ফার্মিয়ন যাদের স্পিন $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$ .....।

অনুশীলনী

(ক) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মহাকাশের দূরত্ব মাপার একক কী ?
- ক নভো একক
- খ আলোক বছর
- গ পারসেক একক
- ঘ সবগুলো

২। নিউট্রন তারকা সংকুচিত হয়ে পরিণত হয়—
- ক সুপারনোভা
- খ কৃষ্ণবস্তু
- গ পালসার
- ঘ ব্ল্যাক হোল

৩। বেতার তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়—
- ক অপটিক্যাল টেলিস্কোপ
- খ রেডিও টেলিস্কোপ
- গ হাবল স্পেস টেলিস্কোপ
- ঘ গ্যালিলীয় টেলিস্কোপ

৪। যে সকল কণা তড়িচ্চুম্বকীয় মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে সেগুলো হলো—
- ক গ্রাভিটন
- খ লেপটন
- গ ফোটন
- ঘ হেড্রন

৫। নক্ষত্রের জন্ম হয়—
- (i) মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ধূলিমেঘের সংকোচনের ফলে
- (ii) তাপ নিউক্লিয় ফিউশন বিক্রিয়ার ফলে
- (iii) বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গমনের ফলে

নিচের কোনটি সঠিক ?
- ক i ও ii
- খ ii ও iii
- গ i ও iii
- ঘ i, ii ও iii

৬। মৌলিক কণিকা কয় ধরনের ?
- ক তিন ধরনের
- খ দুই ধরনের
- গ চার ধরনের
- ঘ পাঁচ ধরনের

৭। লেপটন কণার স্পিন—
- ক 1
- খ $\frac{3}{2}$
- গ $\frac{1}{2}$
- ঘ 0

৮। লেপটন কণা কয় ধরনের—
- ক তিন ধরনের
- খ চার ধরনের
- গ পাঁচ ধরনের
- ঘ দুই ধরনের

৯। হ্যাড্রন কণা—
- ক তিন ধরনের
- খ চার ধরনের
- গ পাঁচ ধরনের
- ঘ দুই ধরনের

১০। লেপটন কণা—
- (i) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় পরিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে
- (ii) শক্তিশালী নিউক্লিয় পরিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে
- (iii) এদের স্পিন $\frac{1}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক ?
- ক i ও ii
- খ ii ও iii
- গ i ও iii
- ঘ i, ii ও iii

১১। কোন কণা 'ঈশ্বর কণা' নামে পরিচিতি ? [চা. বো. ২০১৫; ব. বো. ২০১৫]
- ক বোসন কণা
- খ মেসন কণা
- গ হিগস-বোসন কণা
- ঘ লেপটন কণা

১২। হাবল বিধি অনুসারে ছায়াপথগুলোর অপসারণ বেগ দূরত্বের—
ক ব্যস্তানুপাতিক
খ বর্গের ব্যস্তানুপাতিক
গ সমানুপাতিক
ঘ বর্গের সমানুপাতিক

১৩। হাবল সূত্র অনুযায়ী—
ক $H = vd$
খ $v = Hd$
গ $v = Hd^2$
ঘ $H = vd^2$

১৪। কার পরীক্ষায় ইথারের অস্তিত্ব ভুল প্রমাণিত হয়?
ক ইয়ং
খ মাইকেলসন-মর্লি
গ আইনস্টাইন
ঘ গ্যালিলিও

১৫। মৃত্যুপর্ব শুরুর মুহূর্তে যদি কোনো তারকার ভর $1{\cdot}4\ M_0$ এর বেশি থাকে, তবে কোনোভাবেই এটি শ্বেত বামন হতে পারবে না। ভরের এই সীমাকে বলা হয়—
ক নিউটন সীমা
খ আইনস্টাইন সীমা
গ চন্দ্রশেখর সীমা
ঘ সোয়ার্জশিল্ড সীমা

১৬। মৃত্যুপর্ব শুরুর মুহূর্তে যে সমস্ত তারকার ভর $3\ M_0$ অপেক্ষা বেশি, সেগুলো জীবনচক্র শেষ করবে—
ক নিউট্রন তারকা হিসেবে
খ দৈত্য তারকা হিসেবে
গ কৃষ্ণ বিবর হিসেবে
ঘ শ্বেত বামন হিসেবে

১৭। ঘটনা দিগন্ত ব্যাসার্ধ বা শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ নির্ণয়ের সমীকরণ হলো—
[ব. বো. ২০১৫; রা. বো.২০১৫; কু. বো. ২০১৫]
ক $R_s = \sqrt{\frac{2GM}{c}}$
খ $R_s = \sqrt{\frac{2GM}{R^2}}$
গ $R_s = \frac{2GM}{c^2}$
ঘ $R_s = \frac{2GM}{R^2}$

১৮। গ্রহাণু কোন দুটি গ্রহের কক্ষপথের মাঝ দিয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে? [সি. বো. ২০১৫]
ক মঙ্গল ও শনি
খ বুধ ও শুক্র
গ বৃহস্পতি ও শনি
ঘ মঙ্গল ও বৃহস্পতি

১৯। মহাবিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে এ বিষয়টি উপস্থাপন করেন— [চ. বো. ২০১৫]
ক স্টিফেন হকিং
খ এডুইন হাবল
গ ফ্রিডম্যান
ঘ আইনস্টাইন

২০। মহাবিশ্বের চূড়ান্ত পরিণতি প্রধানত নির্ভর করে— [ঢা. বো. ২০১৫]
(i) মহাবিশ্বের জ্যামিতিক আকৃতি
(ii) অদৃশ্য শক্তি
(iii) অদৃশ্য বস্তু
কোনটি সঠিক?
ক i ও ii
খ ii ও iii
গ i ও iii
ঘ i, ii ও iii

২১। সূর্য প্রতি সেকেন্ড শক্তি বিকিরণ করে— [দি. বো. ২০১৫]
ক 4×10^{26} J
খ 4×10^{27} J
গ 4×10^{28} J
ঘ 4×10^{29} J

২২। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের প্রবর্তক কে? [দি. বো. ২০১৫]
ক জর্জ গ্যামো
খ জর্জ লেমিটার
গ ফ্রেড থেয়েল
ঘ গোল্ড

২৩। যে সব নক্ষত্রের ভর তিন সৌর ভর অপেক্ষা বেশি তাদের জীবনচক্র কীভাবে শেষ হবে? [রা. বো. ২০১৫]
ক নিউট্রন তারা
খ সাদা বামন তারা
গ কৃষ্ণ গহ্বর
ঘ লাল দানব তারা

২৪। নিচের কোনটি এখনও রহস্যময়? [চ. বো. ২০১৫]
ক দৈর্ঘ্য সংকোচন
খ সময় প্রসারণ

(গ) মহাবিশ্বের সংকোচন
(ঘ) ভরের আপেক্ষিকতা

২৫। বিগ-ব্যাং সংঘটিত হয়েছিল— [চ. বো. ২০১৫]
(ক) মহাকাশে
(খ) পৃথিবীতে
(গ) সৌরজগতে
(ঘ) সর্বত্র

২৬। সূর্যের ভর 1.99×10^{30} kg। একটি নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 6 গুণ। এটি কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হলে এর ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ—
(ক) 2.97 km
(খ) 11.80 km
(গ) 17.70 km
(ঘ) 35.40 km

২৭। মৃত্যুপর্ব শুরুর মুহূর্তে যদি কোনো তারকার ভর সৌর ভরের 1.4 গুণ এর বেশি থাকে, তবে কোনোভাবেই এটি শ্বেত বামন হতে পারবে না। [সি. বো. ২০১৫]
(ক) নিউট্রন সীমা
(খ) আইনস্টাইন সীমা
(গ) চন্দ্রশেখর সীমা
(ঘ) সোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ

২৮। যে সব নিউট্রন তারকা রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করে তাদেরকে কী বলে?
(ক) শ্বেত বামন
(খ) কৃষ্ণগহ্বর
(গ) পালসার
(ঘ) সুপারনোভা

২৯। মহাবিশ্বের জ্বালানি পুড়ে শেষ হলে অবশিষ্ট থাকতে পারে—
(i) শ্বেতবামন
(ii) নিউট্রন তারা
(iii) কৃষ্ণগহ্বর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i
(খ) i ও ii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৩০। একটি শ্বেত বামনের ক্ষেত্রে সত্য—
(i) শ্বেত বামনের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের সমান
(ii) শ্বেত বামনের ভর সূর্যের ভরের সমান
(iii) শ্বেত বামনের ব্যাস নিউট্রন নক্ষত্রের ব্যাসের সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর :

১। ঘ	২। ঘ	৩। খ	৪। গ	৫। ঘ	৬। ক	৭। গ	৮। ক	৯। ঘ	১০। গ
১১। গ	১২। গ	১৩। খ	১৪। খ	১৫। গ	১৬। গ	১৭। গ	১৮। ঘ	১৯। খ	২০। গ
২১। ক	২২। খ	২৩। গ	২৪। গ	২৫। ঘ	২৬। গ	২৭। ঘ	২৮। গ	২৯। ঘ	৩০। ক

(খ) সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের চিত্রে সূর্যের গঠন দেখানো হয়েছে।

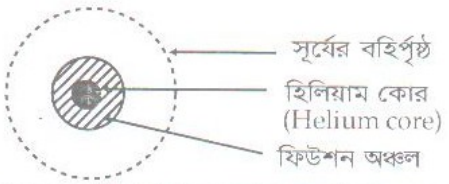

(ক) কৃষ্ণ বিবর কী ?
(খ) সুপারনোভা কীভাবে গঠিত হয় ?
(গ) সূর্যের গঠন ও তাপ আলোক বিকিরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
(ঘ) কৃষ্ণ বিবর কীভাবে সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা কর।

২। সূর্য যদি সংকোচনের মাধ্যমে 3 km ব্যাসার্ধের গোলকে পরিণত হয় তবে এটি আমাদের কাছে অদৃশ্য মনে হবে অর্থাৎ কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হবে। "Seeing is believing" এ প্রবাদ তখন খাটবে না।
(ক) কখন নিউট্রন নক্ষত্র পালসারে পরিণত হয় ?
(খ) সূর্য কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হলে পৃথিবী কি সূর্যের চারদিকে ঘুরবে? —ব্যাখ্যা কর।
(গ) সূর্যের সমান ব্যাসার্ধের নক্ষত্রের ভর কত হলে এটি কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হবে?
সূর্যের ব্যাসার্ধ = 6.96×10^8 m।

(ঘ) সূর্য যদি সংকোচনের মাধ্যমে 3 km ব্যাসার্ধের গোলকে পরিণত হয় তাহলে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্দীপকের উক্তির যথার্থতা যাচাই কর।

৩। আমরা মহাবিশ্বের খুব ছোট একটি অংশে বাস করি। সমগ্র মহাবিশ্বের তুলনায় এটি খুবই নগণ্য। যার ভর 6×10^{24} kg। এই পৃথিবী হতে আমরা সূর্যসহ অনেক নক্ষত্রকে দেখতে সক্ষম হই। এই মহাবিশ্ব একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

(ক) এক আলোক বর্ষ কী?

(খ) বিগ-ব্যাং এর পূর্বে মহাবিশ্বের অবস্থা কীরূপ ছিল বলে তুমি মনে কর?

(গ) পৃথিবীকে কৃষ্ণগহ্বরে রূপান্তর করা হলে এর সোয়ার্জস্কাইল্ড ব্যাসার্ধ কত হবে?

(ঘ) পদার্থবিজ্ঞানের আলোকে মহাবিশ্বের স্থায়িত্ব নিয়ে তোমার ভাবনা সম্পর্কে মতামত দাও।

৪। রুবেল অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বিষয়ে হাবল ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করে। সে সূর্যের অতি সন্নিকটে একটি নক্ষত্রের উপর গবেষণা করছিল। উক্ত নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের 4 গুণ এবং ব্যাসার্ধ 22×10^3 m অন্যদিকে সূর্যের ভর 2×10^{30} kg এবং ব্যাসার্ধ 6.96×10^8 m।

(ক) কোন তারকা নিউট্রন তারকায় পরিণত হবে?

(খ) কখন নিউট্রন নক্ষত্র পালসারে পরিণত হবে?

(গ) সূর্যের মুক্তিবেগ নির্ণয় কর।

(ঘ) উদ্দীপকে নক্ষত্রটি কৃষ্ণবিবরে পরিণত হবে কী? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তোমার মতামত দাও।

৫। ঢাকার আগারগাঁও-এ অবস্থিত স্পারসো কেন্দ্রে রেডিও টেলিস্কোপ এবং অপটিক্যাল টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করা হয়। রেডিও টেলিস্কোপে একটি অ্যান্টেনা ও গ্রাহকযন্ত্র থাকে। অন্যদিকে অপটিক্যাল টেলিস্কোপে অভিলক্ষ এবং অভিনেত্র ব্যবহার করা হয়।

(ক) বিগ-ব্যাং কী?

(খ) কোনো কৃষ্ণবিবরের সোয়ার্জশিল্ড 27 km বলতে কী বুঝ?

(গ) মহাকর্ষের প্রভাবে যদি কোনো নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হতে হয় তাহলে নক্ষত্রের ভর হতে হবে সূর্যের ভরের সমান। যদি সূর্যের ভর 2×10^{30} kg হয় তাহলে নক্ষত্রটিকে ভাঙলে কী পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে?

(ঘ) রেডিও টেলিস্কোপ ও অপটিক্যাল টেলিস্কোপের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা কর। রেডিও টেলিস্কোপ দ্বারা বেতার তারকা সনাক্ত করা যায় কীভাবে?

(গ) সাধারণ প্রশ্ন

১। মহাবিশ্ব কী ?

২। মহাবিস্ফোরণ কী ?

৩। বিগ ক্রাঞ্চ তত্ত্ব কী ?

৪। পালসার থিওরি কাকে বলে ?

৫। ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগল কখন সৃষ্টি হয়েছিল বলে ধারণা করা হয় ?

৬। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কীভাবে মহাবিশ্বের বয়স নির্ধারণ করেছেন ?

৭। 'বৃহৎ বিস্ফোরণ' তত্ত্বের পক্ষে কোন বিজ্ঞানী যুক্তি ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন ?

৮। মহাবিশ্বের পরিণতি সম্বন্ধে কয়টি মত রয়েছে এবং কী কী ?

৯। 'উন্মুক্ত মহাবিশ্ব' তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

১০। 'আবদ্ধ মহাবিশ্ব' তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

১১। 'সমতল মহাবিশ্ব' তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

১২। গ্যালাক্সি কী ?

১৩। নক্ষত্রের শক্তির উৎস কী ? ব্যাখ্যা কর।

১৪। রক্তিম দৈত্য কাকে বলে ?

১৫। নিউট্রন তারকা কাকে বলে ?

১৬। সুপারনোভা কী ?

১৭। কৃষ্ণ গহ্বর বা বিবর কী বা কাকে বলে ?

১৮। চন্দ্রশেখর সীমা কী ?
১৯। লাল বর্ণের অপসারণের সাহায্যে মহাবিশ্ব যে স্ফীত হচ্ছে তা কীভাবে বোঝা যায় ?
২০। নক্ষত্রের জন্মের বিভিন্ন ধারা আলোচনা কর।
২১। নক্ষত্রের মৃত্যুর বিভিন্ন ধারা আলোচনা কর।
২২। মৌলিক কণা কী ? ঈশ্বর কণা, হেড্রন কণা, লেপটন কণা ও কোয়ার্ক কী ?
২৩। হাবল বিধি ব্যাখ্যা কর।
২৪। রেডিও টেলিস্কোপ এবং অপটিক্যাল টেলিস্কোপের মূলনীতি লিখ।
২৫। এক্স-রে টেলিস্কোপ কী ? এর ব্যবহার উল্লেখ কর।
২৬। গামা-রে টেলিস্কোপ কী ? এর ব্যবহার উল্লেখ কর।
২৭। কৃত্রিম উপগ্রহ বলতে কী বোঝ ?
২৮। জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণায় কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা আলোচনা কর।
২৯। কৃত্রিম উপগ্রহের বেগের সমীকরণ লিখ।
৩০। কৃত্রিম উপগ্রহের পর্যায়কালের সমীকরণ লিখ।

(ঘ) ক্রিয়াকর্ম

পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য এবং মহাবিশ্বের পরিণতির উপর একটি প্রতিবেদন রচনা কর এবং শ্রেণিশিক্ষকের নিকট উপস্থাপন কর। শ্রেণিশিক্ষক তিনটি সেরা প্রতিবেদন শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবেন।

(ঙ) কাজ (গাণিতিক সমস্যা)

১। কোনো কৃষ্ণবিবরের ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ 5·9 km। এর ভর ও গড় ঘনত্ব নির্ণয় কর।
[উত্তর : $m = 4·0 \times 10^{30}$ kg, $\rho = 4·66 \times 10^{18}$ kg m^{-3}]

২। একটি গ্রহাণুর কক্ষপথে অর্ধবৃত্তাকার দৈর্ঘ্য 3·5 জ্যোতির্বিদ্যার একক। এর আবর্তনকাল কত ?
[**Hints :** $T^2 \propto d^3$, উত্তর : 6·5 বছর]

৩। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল কোনো তারার হাইড্রোজেন বর্ণালী $486·1 \times 10^{-9}$ m থেকে $485·7 \times 10^{-9}$ m এ বিচ্যুতি হয়েছে। তারাটি দর্শকের দিকে এগোচ্ছে নাকি দূরে সরে যাচ্ছে ? কত বেগে ?
[**Hints :** $\frac{v}{c} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{(486·1 - 485·7) \times 10^{-9}}{486·1 \times 10^{-9}}$; উত্তর : 249 km s^{-1}]

৪। Cygnus X−1 কৃষ্ণ বিবরের ভর সৌর ভরের 8 গুণ। এর ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। সূর্যের ভর $= 2 \times 10^{30}$ kg।
[উত্তর : 23·726 km]

৫। কোনো কোয়াসার হতে আগত আলোক রশ্মি বিশ্লেষণ করে পৃথিবী হতে কোয়াসারটির সরে যাওয়ার দ্রুতি পাওয়া গেল $2·8 \times 10^8$ ms^{-1}। পৃথিবী হতে কোয়াসারটির দূরত্ব কত ? [হাবল ধ্রুবক, $H = 71·0$ $(kms^{-1})/MPc$]
[উত্তর : $12·6 \times 10^9$ Ly]

৬। যদি NGC 4472 গ্যালাক্সি পৃথিবী হতে 770 km/s দ্রুতিতে পশ্চাদপসারণ করে তবে পৃথিবী হতে গ্যালাক্সিটির দূরত্ব নির্ণয় কর। [এখানে $H = 71$ $(kms^{-1})/MPc$]
[উত্তর : 10·89 MPc]

৭। মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, ভস্মীভূত নক্ষত্র এর নিজের মহাকর্ষের প্রভাবেই ধ্বংস হয়ে ব্লাক হোলে পরিণত হবে। তবে এর জন্য ভর হতে হবে দুই সৌর ভরের সমান। সূর্যের ভর $= 2 \times 10^{30}$ kg হলো এর সৌর ভর। উক্ত ক্ষেত্রে ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ কত হবে ?
[**Hints :** $R_s = \frac{2GM}{c^2}$, উত্তর : 5·93 km]

৮। একটি তারকার ভর $6M_0$। তারকাটি কৃষ্ণবিবরে পরিণত হলে এর শোয়ার্জফিল্ড বা সংকট ব্যাসার্ধ কত হবে?
[উত্তর : 17·7 km]

৯। দুটি কৃষ্ণ বস্তুর ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 27 km ও 9 km হলে, এদের ভরের তুলনা কর।
[উত্তর : 3 : 1]